শেখ হাসিনা

ওরা টোকাই কেন

... সমাজের অধিকাংশ মানুষ যে অন্ন বস্ত্র চিকিৎসা আশ্রয়ের অভাবে পীড়িত। এই অভাব যে একটা সমাজব্যবস্থার ফল, সেই সমাজব্যবস্থায় মানুষ যে মানুষকে শোষণ করে চলেছে, সেই শোষণকে যে সুযোগ করে দিচ্ছে রাজনৈতিক পরিস্থিতি, স্বৈরাচার পাকাপোক্ত করতে যে ধর্মের নাম ব্যবহার করা হচ্ছে–এসব কথাই তিনি বলেছেন। গভীর এক বেদনাবোধ থেকে শেখ হাসিনা অবলোকন করেছেন পরিপার্শ্বকে। সেই বেদনাবোধ ছড়িয়ে আছে তাঁর রচনার অধিকাংশ স্থানে। ...

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা শেখ হাসিনা ১৯৪৭ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৭৩ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ পাস করেন। ১৯৮১ সালে তাঁকে বাংলাদেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। ১৯৯৬ সালের ২৩ জুন তাঁর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করার মধ্য দিয়ে তিনি প্রথমবারের মতো প্রধানমন্ত্রী হন। ২০০৮ সালে ২৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ জয়লাভের মাধ্যমে ২০০৯ সালের ৬ জানুয়ারি দ্বিতীয়বার এবং ২০১৪ সালের নির্বাচনে তৃতীয় বারের মত প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। তিনি বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাষ্ট্র (১৯৯৭); ওয়াসেদা বিশ্ববিদ্যালয়, জাপান (১৯৯৭); আব্যারডিন ড্যান্ডি বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাজ্য (১৯৯৭); ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৯৯); ক্যাথলিক বিশ্ববিদ্যালয়, ব্রাসেলস, বেলজিয়াম (২০০০); ব্রিজপোর্ট বিশ্ববিদ্যালয়, কানেকটিকাট, যুক্তরাষ্ট্র (২০০০); প্যাট্রিস লুবাম্বা পিপলস্ ফ্রেন্ডশিপ বিশ্ববিদ্যালয়, মস্কো, (২০০৫); সেন্ট পিটার্সবার্গ স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়, রুশ ফেডারেশন (২০১০) থেকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৯৯ সালে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'দেশীকোত্তম' (ধরিত্রীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ), ২০০৫ সালে ফিলিপাইনের পার্লামেন্ট 'কংগ্রেশনাল মেডেল অভ অ্যাচিভমেন্ট', পার্বত্য চট্টগ্রামে সহিংসতা বন্ধ ও শান্তি আনার লক্ষে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি' সম্পাদনের জন্য ১৯৯৯ সালে ইউনেস্কো হুফে-বোগনি পুরস্কার প্রদান করেন। তিনি ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক শান্তি পদক ও কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে মানবসম্পদ উন্নয়ন ও আন্তর্জাতিক সমঝোতার জন্য 'ইন্দিরা গান্ধী স্বর্ণপদক ২০০৯' এবং ২০১০ সালে তিনি জাতিসংঘ কর্তৃক 'মিলিনিয়াম ডেভলপমেন্ট গোল্ড' পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

পঞ্চম মুদ্রণ ফাল্গুন ১৪২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৩৯৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯
দ্বিতীয় মুদ্রণ অগ্রহায়ণ ১৩৯৬ নভেম্বর ১৯৮৯
তৃতীয় মুদ্রণ ফাল্গুন ১৩৯৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২
চতুর্থ মুদ্রণ ভাদ্র ১৪০৪ সেপ্টেম্বর ১৯৯৭

প্রকাশক ওসমান গনি আগামী প্রকাশনী ৩৬ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০ ফোন ৯৫৯১১৮৫, ০১৭৯০৫৮৬৩৬২
প্রচ্ছদ রফিকুন নবী ফটোগ্রাফ পাভেল রহমান
মুদ্রণে স্বরবর্ণ প্রিন্টার্স ১৮/২৬/৪ শুকলাল দাস লেন, ঢাকা
মূল্য ঃ ১২৫.০০ টাকা

Ora Tokai Keno by Sheikh Hasina
Published by Osman Gani of Agamee Prakashani
36 Bangla Bazar Dhaka-1100 Bangladesh.
e-mail : info@agameeprakashani-bd.com
Fith Print : February 2015

Price : Taka 125.00 only

ISBN 978 984 04 1687 5

উৎসর্গ

বাবা ও মা

সূচিপত্র

ভূমিকা

আমাদের রাজনীতিবিদদের মধ্যে খুব বেশিজন লেখালেখি করেন না। যাঁরা করেন, তাঁদের মধ্যেও শেখ হাসিনার নাম সহজে আসে না। 'ওরা টোকাই কেন?' বইটি তাই যদি পাঠকসমাজে একটু বিস্ময়ের সৃষ্টি করে, তাতে খুব অবাক হবার কিছু থাকবে না।

ছটি প্রবন্ধ নিয়ে এ বই। এসব প্রবন্ধে ব্যক্তিগত কথা আছে, পারিবারিক কথা আছে, দেশের কথা আছে, দশের কথা আছে, রাজনীতির কথা আছে, সমাজের কথা আছে। নিজের চারপাশটা যেমন ভাবে দেখেছেন লেখিকা, তেমনি তা ফুটিয়ে তুলেছেন। যাকে বলা যায় ছক-কাটা রচনা, এ বইয়ের প্রবন্ধগুলো তা নয়। এগুলো হচ্ছে স্বতঃস্ফূর্ত লেখা— তাই এক প্রসঙ্গ থেকে তিনি অন্য প্রসঙ্গে চলে গেছেন অনায়াসে। এক মানুষের কথা বলতে বলতে অন্য মানুষ বা একাধিক মানুষের কথা বলেছেন। গ্রামের প্রকৃতির কথা বলতে গিয়ে অর্থনৈতিক কাঠামোর কথা উঠেছে, একটি মেয়ের কথা বলতে গিয়ে নারী-নির্যাতনের কথা উঠেছে, দারিদ্র্যের কথা বলতে গিয়ে স্বাস্থ্যের কথা এসেছে। স্বাস্থ্যের কথা প্রসঙ্গে এসেছে পরিবার-পরিকল্পনার কথা। সমাজের অধিকাংশ মানুষ অন্ন বস্ত্র চিকিৎসা আশ্রয়ের অভাবে পীড়িত। এই অভাব যে একটা সমাজব্যবস্থার ফল, সেই সমাজব্যবস্থায় মানুষ যে মানুষকে শোষণ করে চলেছে, সেই শোষণকে যে সুযোগ করে দিচ্ছে রাজনৈতিক পরিস্থিতি, স্বৈরাচার পাকাপোক্ত করতে যে ধর্মের নাম ব্যবহার করা হচ্ছে— এ সব কথাই তিনি বলেছেন। গভীর এক বেদনাবোধ থেকে শেখ হাসিনা অবলোকন করেছেন পারিপার্শ্বকে। সেই বেদনাবোধ ছড়িয়ে আছে অধিকাংশ স্থানে।

জায়গায় জায়গায় লেখিকা যে-রচনাকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন, তার প্রশংসা না করে পারা যায় না। যেমন :

বাইগার নদী এখন টুঙ্গীপাড়া গ্রামের পাশ দিয়ে কুল কুল ছন্দে ঢেউ তুলে বয়ে চলেছে। রোদ ছাড়ালে বা জ্যোৎস্না ঝরলে সে নদীর পানি রূপোর মতো ঝিকমিক করে।

নদীর পাড় ঘেঁষে কাশবন, ধান-পাট-আখ ক্ষেত, সারি সারি খেজুর-তাল-নারকেল-আমলকি গাছ, বাঁশ-কলাগাছের ঝাড়, বুনো লতাপাতার জংলা, সবুজ ঘন ঘাসের চিকন লম্বা সতেজ ডগা। শালিক-চড়ুই পাখিদের কল-কাকলী, ক্লান্ত দুপুরে ঘুঘুর ডাক–সব মিলিয়ে ভীষণ রকম ভালোলাগার একটুকরো ছবি যেন। আশ্বিনের এক সোনালি রোদ্দুর ছড়ানো দুপুরে এই টুঙ্গীপাড়া গ্রামে আমার জন্ম। গ্রামের ছায়ায় ঘেরা, মায়া ভরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও শান্ত নিরিবিলি পরিবেশ এবং সরল সাধারণ জীবনের মাধুর্যের মধ্য দিয়ে আমি বড় হয়ে উঠি।

রচনার এই প্রসাদগুণ সর্বত্র দেখা যাবে না। কেননা স্মৃতির মধ্য দিয়ে দেখা সেই মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ আজ আর জীবনের একমাত্র সত্য নয়। আজ দেশের সর্বত্র অভাব আর অনাচার। তার কথা বলবার ভাষা আলাদা।

তবে শুধু অভাব-অনাচারই সে সত্য তা নয়। তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আছে, সেকথাও সমান সত্য। এই প্রতিবাদ করে টোকাইরা, প্রতিবাদ করে নূর হোসেন, তাদের কথা দিয়ে বইয়ের শেষ। তবে তাদের কথা শেষ হবার নয়।

বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আনিসুজ্জামান
১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৯

লেখকের কথা

প্রকাশকের অনুরোধ কিছু লিখতেই হবে। কত কথা যে মনে পড়ে। কত কথা যে বুকের গভীরে সাজানো থাকে। কোনটা রাখি কোনটা লেখি। মনের ভাবনার সঙ্গে কলম কি তাল মেলাতে পারে?

আমি প্রাবন্ধিক নই। তাই প্রবন্ধ লেখার নির্দিষ্ট নিয়ম আমি মানতে পারিনি। আমার লেখাগুলো আসে মনের ভাবনা থেকে। আমার চারপাশের জীবন ও তার ঘটনাবহুল অভিজ্ঞতাকে লিখে রাখার অভ্যাস আমাকে এই গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি লিখতে দুঃসাহসী করে তোলে। কোন দৃশ্য বা ঘটনা কিভাবে দেখি, কি হওয়া উচিত বা কিভাবে দেখতে চাই— আমর সেই ভাবনাগুলি শব্দে গেঁথে রাখতে চেষ্টা করি। তাই প্রবন্ধের ছকে বাঁধা নিয়মে আমার লেখাগুলো হয়ে ওঠে না। এগুলিকে আমার রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনার প্রবন্ধ হিসেবে পাঠক সমাজ গ্রহণ করবেন বলে আশা রাখি।

আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ড. আনিসুজ্জামান লেখাগুলো সযত্নে পড়ে যে মূল্যবান ভূমিকা লিখে দিয়েছেন তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আমার চিন্তা-চেতনায় সেটাই একটা বিরাট আত্মবিশ্বাস অর্জন। টোকাই চরিত্রের উদ্ভাবক শিল্পী রফিকুন নবীর সুন্দর প্রচ্ছদটির জন্য অভিনন্দন। ফটো সাংবাদিক পাভেল রহমানের জীবিত নূর হোসেনের প্রতিবাদী ছবিটি এ বইটিকে অনেকখানি সমৃদ্ধ করেছে।

আমার চলার পথটি সহজ নয়। বহু চড়াই-উৎরাই পার হতে হচ্ছে। নানা সমস্যা চোখে পড়ে। দুঃখ-দারিদ্র্যক্লিষ্ট আমাদের সমাজ জীবনের এই দিকগুলি সবাই চিন্তা করুক। সমাজ ও দেশ উন্নয়নের কাজে রাজনৈতিক ও মানবিক চেতনায় সবাই উজ্জীবিত হয়ে উঠুক, এটাই আমার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা।

শেখ হাসিনা
১১ আগস্ট ১৯৮৯

বঙ্গবন্ধু ভবন
বাড়ি নং ১০ সড়ক নং ১১ (নতুন)
ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা
ঢাকা-১২০৫

স্মৃতির দখিন দুয়ার

গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গীপাড়া গ্রামখানি একসময় মধুমতি নদীর তীরে ছিল। বর্তমানে মধুমতি বেশ দূরে সরে গেছে। তারই শাখা হিসেবে পরিচিত বাইগার নদী এখন টুঙ্গীপাড়া গ্রামের পাশ দিয়ে কুল কুল ছন্দে ঢেউ তুলে বয়ে চলেছে। রোদ ছড়ালে বা জ্যোৎস্না ঝরলে নদীর পানি রূপোর মতো ঝিকমিক করে।

নদীর পাড় ঘেঁষে কাশবন, ধান-পাট-আখ ক্ষেত, সারিসারি খেজুর, তাল-নারকেল-আমলকি গাছ, বাঁশ কলাগাছের ঝাড়, বুনো লতা-পাতার জংলা, সবুজ ঘন ঘাসের চিকন লম্বা লম্বা সতেজ ডগা। শালিক-চড়ুই পাখিদের কল-কাকলি, ক্লান্ত দুপুরে ঘুঘুর ডাক। সব মিলিয়ে ভীষণ রকম ভালোলাগার একটুকরো ছবি যেন। আশ্বিনের এক সোনালি রোদ্দুর ছড়ানো দুপুরে এই টুঙ্গীপাড়া গ্রামে জন্ম। গ্রামের ছায়ায় ঘেরা, মায়ায় ভরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও শান্ত নিরিবিলি পরিবেশ এবং সরল-সাধারণ জীবনের মাধুর্যের মধ্য দিয়ে আমি বড় হয়ে উঠি।

আমাদের বসতি প্রায় দুশো বছরের বেশি হবে। সিপাহী বিপ্লবের আগে তৈরি করা দালান-কোঠা এখনও রয়েছে। আমাদের আত্মীয়-স্বজনরা সেখানে বসবাস করেন। তবে বেশির ভাগ ভেঙ্গে পড়েছে, সেখানে এখন সাপের আখড়া। নীলকর সাহেবদের সঙ্গে আমাদের পূর্বপুরুষদের অনেক গোলমাল হতো। মামলা-মোকদ্দমা হয়েছে।

ইংরেজ সাহেবদের সঙ্গেও গণ্ডগোল লেগেই থাকতো। একবার এক মামলায় এক ইংরেজ সাহেবকে হারিয়ে জরিমনা পর্যন্ত করা হয়েছিল। ইতিহাসের নীরব সাক্ষী হয়ে সেই ভাঙ্গা দালান এখনও বিধ্বস্ত অবস্থায় রয়েছে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাক সেনাবাহিনী ঐ দালানের ওপর হামলা চালিয়েছিল। আমার দাদা-দাদিকে সামনের রাস্তায় বসিয়ে রেখে আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছিল।

আমাদের গ্রামে ঢাকা থেকে স্টিমারে যেতে সময় লাগতো সতেরো ঘন্টা। রাস্তাঘাট ছিলই না। নৌকা ও পায়ে হাঁটা পথ একমাত্র ভরসা ছিল। তারপরও সেই গ্রাম আমার কাছে বিরাট আকর্ষণীয়। এখন অবশ্য গাড়িতে যাওয়ায় যায়। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে স্পিডবোটেও যাওয়া যায়। গোপালগঞ্জ থেকে টুঙ্গীপাড়া নৌকায় যেতে তিন-চার ঘণ্টা সময় লাগে।

আমার শৈশবে স্বপ্ন-রঙিন দিনগুলো কেটেছে গ্রাম-বাংলার নরম পলিমাটিতে, বর্ষার কাদা-পানিতে, শীতের মিষ্টি রোদ্দুরে, ঘাসফুল আর পাতায় পাতায় শিশিরের ঘ্রাণ নিয়ে, জোনাক-জ্বলা অন্ধকারে ঝিঁঝিঁর ডাক শুনে, তাল-তমালের ঝোপে বৈচি, দীঘির শাপলা আর শিউলি-বকুল কুড়িয়ে মালা গেঁথে, ধুলোমাটি মেখে, বর্ষায় ভিজে খেলা করে।

আমার বাবা শেখ মুজিবুর রহমান রাজনীতি করতেন। বেশির ভাগ সময় তাঁকে তখন জেলে আটকে রাখা হতো। আমি ও আমার ছোট ভাই কামাল মায়ের সঙ্গে গ্রামের বাড়িতে দাদা-দাদির কাছে থাকতাম। আমার জন্মের সময় বাবা কলকাতায় পড়তেন, রাজনীতি করতেন। খবর পেয়েও দেখতে আসেন বেশ পরে।

আমার বাবা যখনই সময় ও সুযোগ পেতেন একবার বাড়ি এলে আমরা কিছুতেই তাঁকে ছেড়ে নড়তাম না। বাবার কোলে বসে গল্প শোনা, তার সঙ্গে খাওয়া, আমার শৈশবে যতটুকু পেয়েছি তা মনে হত অনেকখানি।

বাবাকে একবার গোপালগঞ্জ থানায় আনা হলে দাদার সঙ্গে আমি ও কামাল দেখতে যাই। কামালের তো জন্মই হয়েছে বাবা যখন ঢাকা

জেলে। ও বাবাকে খুব কাছ থেকে কখনও দেখেনি। আমার কাছেই বাবার গল্প শুনত মুগ্ধ হয়ে। গোপালগঞ্জ জেলখানার কাছে পুকুর পাড়ে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, বাবাকে নিয়ে যাবে কোর্টে তখনই আমরা দেখব। কামাল কাছ ঘেঁষে বলল : হাচুপা, তোমার আব্বাকে আব্বা বলতে দেবে। আমার শৈশবের হৃদয়ের গভীরে কামালের এই অনুভূতিটুকু আজও অম্লান হয়ে আছে। বাবাকে আমাদের শৈশবে-কৈশোরে খুব কমই কাছে পেয়েছি। শৈশবে পিতৃস্নেহ বঞ্চিত ছিলাম বলে দাদা-দাদি, আত্মীয়-স্বজন, গ্রামের মানুষের অশেষ স্নেহ-মমতা পেয়েছি।

আমাদের পরিবারের জন্য মৌলভি, পণ্ডিত ও মাস্টার বাড়িতেই থাকতেন। আমরা বাড়ির সব ছেলেমেয়ে সকাল-সন্ধ্যা তাঁদের কাছে লেখাপড়া শিখতাম। গ্রামের প্রাইমারি স্কুলেও কিছুদিন পড়শোনা করেছিলাম। আমার কৈশোরকাল থেকে শহরে বাস করলেও গ্রামের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ ছিল। ১৯৫২ সালে আমার দাদার সঙ্গে স্নেহময়ী দাদা-দাদি ও আত্মীয়-স্বজন বেশিরভাগ গ্রামে বাস করতেন। স্কুল ছুটি হলে বা অন্যান্য উৎসবের বছরে প্রায় তিন-চারবার গ্রামে চলে যেতাম। আজও আমার গ্রামের প্রকৃতি, শৈশব আমাকে ভীষণভাবে পিছু টানে।

আমার শৈশবের দিনগুলো ভীষণরকম স্মৃতিময়। আজ সেসব দিনের কথা যেন স্মৃতির দখিন দুয়ার খোলা পেয়ে বারবার ভেসে আসছে। একটি ঘটনার কথা উল্লেখ না করে পারছি না। আমার বাবার এক চাচাতো বোন, আমার চেয়ে বয়সে তিন-চার বছর বড় হবে। সেই ফুপুর সঙ্গে বাড়ির সব ছেলেমেয়েরা স্কুলে যাচ্ছি। খালের ওপর ছিল বাঁশের সাঁকো। সেই সাঁকোর ওপর দিয়ে যেতে হবে। প্রথমদিন কি দারুণ ভয় পেয়েছিলাম। আমার হাত-পা কাঁপছিল, ফুপুই আমাকে সাহস দিয়ে হাত ধরে সাঁকো পার করিয়ে দিয়েছিল। এরপর কখনও ভয় করেনি। বরং সবার আগে আমিই থাকতাম।

খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে সমবয়সী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নদীর ধারে বেড়ানো, শীতের দিনে নদীর উষ্ণ পানিতে পা ভেজানো আমার কাছে ভীষণ রকম লোভনীয় ছিল। নদীর পানিতে জোড়া নারকেল

ভাসিয়ে অথবা কলাগাছ ফেলে সাঁতার কাটা, গামছা বিছিয়ে টেংরা পুঁটি খল্লা মাছ ধরা। বর্ষাকালে খালে অনেক কচুরিপানা ভেসে আসতো। সেই কচুরিপানা টেনে তুললে তার শেকড় থেকে বেরিয়ে আসতো কই ও বাইন মাছ। একবার একটা সাপ দেখে খুব ভয় পেয়েছিলাম।

বৈশাখে কাঁচা আম পেড়ে কুচি কুচি করে কেটে সর্ষেবাঁটা ও কাঁচা মরিচ মাখিয়ে, তারপর কলাপাতা কোনাকুনি করে সেই আম মাখা পুরে, তার রস টেনে খাওয়ার মজা ও স্বাদ আমাকে এখনও আপ্লুত করে রাখে। কলাপাতায় এই আম মাখা পুরে যে না খেয়েছে, সে কিছুতেই এর স্বাদ বুঝবে না। আর কলাপাতায় এ আম মাখা পুরলে তার ঘ্রাণই হতো অন্য রকম। এভাবে আম খাওয়া নিয়ে কত মারমারি করেছি। ডাল ঝাঁকিয়ে বরুই পেড়ে কাড়াকাড়ি করে খেতাম। গ্রামের বড় তালাবের (পুকুর) পাড়ে ছিল বিরাট এক বরুই গাছ। ঝাঁকুনির ফলে লালের আভা লাগা সব থেকে টলটলে বরুইটা পুকুরের গভীর পানিতে গিয়ে পড়ত এবং কারো পক্ষে কিছুতেই সেটা যখন তুলে আনা সম্ভব হতো না, তখন সেই বরুইটার জন্য মন জুড়ে থাকা দুঃখটুকু এখনও ভুলতে পারলাম কই?

পাটক্ষেতের ভেতর দিয়ে আমরা ছোট্ট ডিঙ্গি নৌকা চড়ে ঘুরে বেড়াতাম। আমার দাদার একটি বড় নৌকা ছিল। যার ভেতরে দুটো ঘর ছিল, জনালাও ছিল বড় বড়। নৌকার পেছনে হাল, সামনে দুই দাঁড় ছিল। নৌকার জানালায় বসে নীল আকাশ আর দূরের ঘন সবুজ গাছপপালা ঘেরা গ্রাম দেখতে আমার বড় ভালো লাগতো। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময় সেই নৌকা ভেঙ্গে নষ্ট হয়ে যায়। শৈশবের ফেলে আসা সেই গ্রাম আমার কাছে এখনও যেন সুভাষিত ছবির মতো।

আমার বাবার জন্মস্থানও টুঙ্গীপাড়ায়। তিনি এখন ঐ গ্রামের মাটিতেই ছায়াশীতল পরিবেশে ঘুমিয়ে আছেন। তার পাশেই আমার দাদা-দাদির কবর— যারা আমার জীবনকে অফুরন্ত স্নেহমমতা দিয়ে ভরিয়ে তুলেছিলেন। আজ আমার গ্রামের মাটিতেই তারা মিশে আছে। ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্ট ঘাতকের নির্মম বুলেটে আমার মা, বাবা, ভাই ও আত্মীয়-পরিজন অনেককে হারাই। দেশ ও জাতি হারায়

তাদের বেঁচে থাকার সকল সম্ভাবনা, আশা-আকাঙ্ক্ষার স্বাধীন সত্তা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। ঘাতকের দল বাংলার প্রাণকেন্দ্র ঢাকা থেকে সরিয়ে সেই মহাপুরুষকে নিভৃতে পল্লীর মাটিতেই কবর দিয়েছে। ইতিহাসের পাতা থেকে তাঁকে মুছে ফেলার ব্যর্থ প্রয়াস চালিয়েছে—কিন্তু পেরেছে কি?

বাবার কাছাকাছি বেশি সময় কাটাতাম। তাঁর জীবনের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেক আলোচনা করার সুযোগও পেতাম। তাঁর একটা কথা আজ খুব বেশি করে মনে পড়ে। তিনি প্রায়ই বলতেন 'শেষ জীবনে আমি গ্রামে থাকবো। তুই আমাকে দেখবি। আমি তোর কাছেই থাকবো।' কথাগুলো আমার কানে এখনও বাজে। গ্রামের নিঝুম পরিবেশে বাবার মাজারের এই পিছুটান আমি পৃথিবীর যেখানেই থাকি না কেন, আমাকে বারবার আমার গ্রামে ফিরিয়ে নিয়ে যায়।

আমি এখন নিজেকে রাজনীতির সঙ্গে নিয়েছি। দেশ ও জনগণের কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করতে পেরে আমি গর্বিত। আমার জীবনের শেষ দিনগুলো আমি টুঙ্গীপাড়ায় স্থায়ীভাবে কাটাতে চাই। খুব ইচ্ছে আছে নদীর ধারে একটা ঘর তৈরি করার। আমার বাবা-মার কথা স্মৃতিকথামূলকভাবে লেখার ইচ্ছে আছে। আমার বাবা রাজনীতিবিদ মুজিবকে সবাই জানতেন। কিন্তু ব্যক্তি মুজিবও কত বিরাট হৃদয়ের ছিলেন, সেসব কথা আমি লিখতে চাই।

গ্রামকে তো আমি আমার শৈশবের গ্রামের মতো করেই ফিরে পেতে চাই। কিন্তু চাইলেই তো আর হবে না। এখন সময় দ্রুত বদলাচ্ছে। যান্ত্রিকতার স্পর্শে গ্রামের সরল সাধারণ জীবনেও ব্যস্ততা বেড়েছে, চমক জেগেছে। মানুষও ক্রমশ অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। এই শতাব্দীতে বাস করে বিজ্ঞানের আশীর্বাদকে অস্বীকার করার উপায় নেই। বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর গ্রামীণ জীবনের মানোন্নয়ন ও শ্রমের ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে। আমাদেরও এগিয়ে যেতে হবে।

আমার শত ব্যস্ততা থাকলেও এবং একটু সময় পেলেই আমি চলে যাই। কেন যে মনে হয় আমার শৈশবের গ্রামকে ফিরে পেতাম! গ্রামের মেঠোপথটা যখন দূরে কোথাও হারিয়ে যায় আমার গলা ছেড়ে

গাইতে ইচ্ছে করে, 'গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙ্গা মাটির পথ, আমার মন ভোলায় রে... ।'

শৈশব ও কৈশোরের স্কুলপাঠ্য বইয়ের গ্রাম সম্পর্কিত কবিতাগুলো আমার খুব সহজেই মুখস্থ হয়ে যেতো। 'আমাদের ছোট গাঁয়ে ছোট ছোট ঘর', 'তুমি যাবে ভাই যাবে মোর সাথে আমাদের ছোট গাঁয়ে', 'বহুদিন পরে মনে পড়ে আজ পল্লী মায়ের কোল', 'বাঁশ বাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ঐ', 'মেঘনা পারের ছেলে আমি', 'ছিপখান তিন দাঁড়, তিনজন মাল্লা', 'তালগাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে—এসব কবিতার লাইন এখনও মনে আছে।

বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির স্বর্ণদ্বারে পাঠিকা হিসেবে যখন আমি প্রবেশ করি, তখন তো আমি কিশোরী। পরে হয়েছিলাম ছাত্রী। গ্রামভিত্তিক উপন্যাস, গল্প ও কবিতা যখনই সুযোগ পেয়েছি পড়েছি। বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' আমাকে প্রথম ভীষণভাবে আচ্ছন্ন করে। এখনও হাতের কাছে পেলে পাতা ওল্টাই। দুর্গা ও অপু দু'ভাই-বোনের ভালোবাসা, স্নেহ-মমতা, খুনসুটি, গ্রামময় ঘুরে বেড়ানো, কিছু পেলে ভাগাভাগি করে খাওয়া, অপুর প্রতি দুর্গার কর্তব্যবোধ, দুর্গার অসুখ ও মৃত্যু। অপুর দুঃখ ও দিদিকে হারানোর বেদনা, বুড়ি ঠাকুরমা'র অভিমান, দুঃখ-ব্যথা, অসহায়ত্ব। অপুর মা সর্বজয়া, দুঃখ-দারিদ্র্য যার নিত্যসঙ্গী, জীবনের সঙ্গে প্রতিনিয়ত যার সংগ্রাম, সন্তানদের প্রতি স্নেহ-মমতা। অপু-দুর্গার বাবার প্রবাস চাকরি জীবন, দুর্গার মৃত্যুর পর তার জন্য বাবার আনা শাড়ি, এসব ছোট্ট ছোট্ট দুঃসময় বাস্তব জীবনের বহু খণ্ড খণ্ড চিত্র তো বাংলাদেশের গ্রাম জুড়ে আজও রয়েছে। পথের পাঁচালী আমার নিজের গ্রামকেই মনে করিয়ে দেয়। বাংলা সাহিত্যে পথের পাঁচালী শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। রবীন্দ্রনাথের গ্রামভিত্তিক ছোটগল্পগুলোও আমার ভীষণ প্রিয়। গ্রামকে নিয়ে শিল্পী জয়নুল আবেদীনের স্কেচগুলোও বাস্তব। কলাগাছের ঝোপে নোলক পরা বউয়ের ছবিটি এখনও মনে পড়ে। আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যও মোটেই অনুল্লেখ করার মতো নয়। বাউল গান, বৈষ্ণব গান, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি মাঝির গান এসবই আবহমান কালের গৌরব।

গ্রামই আমাদের জীবন। আলোকোজ্জ্বল আধুনিক রাজধানী ও শহরকে বাঁচিয়ে রাখছে গ্রামীণ অর্থনীতি আর মানুষ। ছোট-বড় সব গ্রামকেই আমাদের ঐতিহ্য অনুসারী আধুনিক ও আদর্শ গ্রাম হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

গ্রামোন্নয়নের জন্য সবার আগে প্রয়োজন সুষ্ঠু বিদ্যুতায়ন ব্যবস্থা। প্রতিটি গ্রামে আধুনিক সরঞ্জামসহ হাসপাতাল, স্কুল, মাতৃসদন, কৃষি ও কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, খেলার মাঠ প্রভৃতি থাকবে। ঘরবাড়ির অবস্থা মজবুত ও পরিচ্ছন্ন হবে। রাস্তাঘাট প্রশস্ত ও পাকা হবে, যানবাহন চলাচলে সুব্যবস্থা করে শহরের সঙ্গে যোগযোগ সহজতর করে তুলতে হবে।

কৃষিজমিগুলো সমবায়ের মাধ্যমে একত্রিত করে কৃষি ব্যবস্থা ও উৎপন্ন দ্রব্যের সুষম বণ্টনসহ উৎপাদিত শস্য যাতে নির্ধারিত মূল্যে বাজারজাত করা হয় ও খাদ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা স্বাস্থ্যসম্মত হয় তার উদ্যোগ নিতে হবে। সাধারণ মানুষের কাছে গ্রাম থেকে উৎপাদিত খাদ্যশস্য সহজপ্রাপ্য করে তুলতে হবে। যেসব উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী রফতানি হবে ও কাচাঁমাল হিসেবে কারখানায় যাবে তার সুষ্ঠু সরবরাহ সরকারি ব্যবস্থাপনায় আনতে হবে। কৃষিকাজকে আধুনিকীকরণ করে বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থাপনায় আনতে হবে। সারা বছর ধরে মৌসুমানুযায়ী সকল প্রকার ফসল দ্বিগুণ থেকে তিনগুণ উৎপাদন করতে হবে। কোনো জমি পতিত পড়ে থাকবে না। নদ-নদী, খাল-বিল, দিঘি-পুকুরে মৎস্য চাষ করে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির ব্যাপক উৎপাদন বৃদ্ধি লক্ষ্য রেখে খামার গড়ে তুলতে হবে। সারাবিশ্বে আজ খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবন হচ্ছে। আমাদের এই দুঃখ-দারিদ্র্য-দুর্ভিক্ষের দেশে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিকে জাতীয়ভাবে অগ্রাধিকার দেয়া উচিত বলে আমি মনে করি। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করলেই গ্রামের মানুষ শহরে এসে ভিড় জমাবে না। তাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে ও কৃষি উপকরণ সহজ প্রাপ্তির ব্যবস্থা করে সারাবছর কর্মব্যস্ত রাখতে হবে। আমাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য অনুসারী গ্রামীণ কুটির শিল্পের মানোন্নয়ন করে ব্যাপক প্রসার ঘটাতে হবে। গ্রামীণ কৃষিজাত পণ্য ও ছোট-বড় সকল

ব্যবসা এবং শিল্প বিকাশের পথ করে দিতে হবে। এর ফলে কর্মসংস্থানেরও ব্যবস্থা হবে। আমি মনে করি আধুনিক বা যুগোপযোগী কৃষিব্যবস্থাই আমাদের উৎপাদন বৃদ্ধিতে প্রধান হাতিয়ার হতে পারে। এইসঙ্গে যুগ যুগ ধরে শোষিত-বঞ্চিত হয়ে আসা অবহেলিত কৃষকদের পোড়খাওয়া দুর্ভিক্ষ–দারিদ্র্যক্লিষ্ট ভাগ্যকেও পরিবর্তিত করে তার বেঁচে থাকার ন্যূনতম অধিকারগুলো সুনিশ্চিত করতে হবে।

আমাদের গ্রামের মেয়েরা সবচেয়ে বেশি পশ্চাৎপদ। যুগ যুগ ধরে চলে আসা সামাজিক বিধিনিষেধ, ধর্মীয় গোড়ামি ও কুসংস্কারাচ্ছন্নতার বেড়াজাল ভেঙ্গে তাদের মেধা বিকাশের পথ করে দিতে হবে। তাদের শ্রমশক্তিকেও সমমর্যাদায় উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে নিয়োজিত করতে হবে। সামাজিক ক্ষেত্রে তারা নানারকম অনাচার–অবিচারের শিকার হয়ে থাকে। মেয়েরা সার্বজনীন শিক্ষার সুযোগ পেলে, অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে দাঁড়ালে মননে–ব্যক্তিত্বে সাহসের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ পেলে কোনো প্রকার নির্যাতন বা শোষণ তাদের অন্তরায় হয়ে থাকবে না। নিজের অধিকার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম মেয়েদেরই শক্তহাতে নিতে হবে। তবে রাষ্ট্রীয়ভাবে তার নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করে তাকে সকল প্রকার সহযোগিতা করতে হবে।

গ্রামের উন্নতিকল্পে আরও একটি বিষয় আমাকে ভীষণভাবে আতঙ্কিত করে তোলে। সেটা হলো, আমাদের সবচেয়ে অবহেলিত অসহায় অংশ পুষ্টিহীন কঙ্কালসার শিশুর সংখ্যাধিক্য। দেশের সর্বত্র আমি যে গ্রামেই গিয়েছি এই একই চেহারার শিশুদের দেখেছি। এসব শিশু যখন জন্ম নিচ্ছে, তখন অবশ্যই তাদের ভবিষ্যৎকে সম্ভাবনাময় ও নিরাপত্তাপূর্ণ করে তুলতে হবে। তাদের শৈশব-কৈশোর ও যৌবনকে আনন্দময় ও সুখময় করে তোলার উদ্যোগ আমাদের নিতে হবে। তাদের সচ্ছল-সমৃদ্ধময় ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেও আমাদের বর্তমানকে তাদের জন্য উৎসর্গ করার দৃঢ় মানসকিতা গ্রহণ করা উচিত। এবং সেই সঙ্গে সকলকে নিঃস্বার্থ হতে হবে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করে সক্ষম জনগণকে উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে লাগাতে হবে।

গ্রামের উন্নয়ন প্রক্রিয়া বলতে আমি কোনো ছিঁটেফোঁটা বা সাময়িক ব্যবস্থায় বিশ্বাসী নই। যুগ যুগ ধরে অন্ধকারে পড়ে থাকা

পশ্চাৎপদ জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত প্রাচীন কৃষি-ব্যবস্থার প্রচলিত ধ্যান-ধারণার সামগ্রিক সংস্কার করে আধুনিক গ্রাম গড়ে তুলতে হবে। আমি কোনো অনুদানমূলক বা প্রতিশ্রুতিপূর্ণ উন্নয়ন নয়, 'টোটাল' বা 'সামগ্রিক' উন্নয়ন চাই। এজন্য প্রয়োজনবোধে দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে এবং শিক্ষিত সচেতন তরুণ সমাজকে কাজে নামাতে হবে।

গ্রাম-জীবনের অসংখ্য চরিত্র আমি খুব কাছ থেকে দেখেছি। আমাদের গ্রামের আক্কেলের মায়ের কথা খুব মনে পড়ে। বুড়ি হয়ে গেছে এখন। তিন ছেলে তার। অল্প বয়সে বিধবা হয়েছিল। গ্রামের সব পাড়ায়, ঘরে ঘরে তার অবাধ যাতায়াত। সব ঘরের হাঁড়ির খবর তার নখদর্পণে। সে যেন গ্রামের গেজেট। কার ঘরে রান্না করতে হবে, পিঠে বানাতে হবে– সব কাজে আক্কেলের মা হাজির। আমরা যখনই গ্রামে যাই পিঠা তৈরি বা তালের ফুলুরি বানাতে তার ডাক পড়তো। পথে যেতে তার ঘরে একবার ঢু মারলে পিঁড়ি পেতে বসাবেই, পান-সুপারিও খাওয়াবে।

ধান কাটার মৌসুমে দক্ষিণ দিক থেকে অনেক লোক আসতো। 'পরবাসী' নামে তারা পরিচিত। ধান কাটা, মাড়াই প্রভৃতি কাজ তারা করতো। ছোট্ট খুপরি ঘর তুলে পুরো মৌসুমটা থাকতো। ধান তোলা হলে নিজ নিজ অংশ নিয়ে তারা চলে যেতো। বর্ষার মৌসুমে নৌকায় করে বেদেনীরা আসতো। রং-বেরঙের কাঁচের চুড়ি আমাদের হাত টিপে টিপে পরিয়ে দিতো। ফিতে, আলতা, চিরুণি, আয়না, নানা ধরনের খেলনা ও সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে বছরের নির্ধারিত সময়টিতে তারা ঠিক সময়মতো চলে আসতো। আবার কখনও সাপের খেলা দেখাতো, বাঁশি বাজিয়ে কতরকম গান শোনাতো। গ্রামের বৌ-ঝিরা তাদের কাছে ভিড় জমিয়ে দেশি টোটকা ওষুধ নিতো। ঝাড় ফুঁক ইত্যাদি কত প্রকার তাবিজ তারা দিয়ে যেতো সবাইকে। বিনিময়ে ধান-খুদ বা সব্‌জি-ডিম-মুরগিও নিতো।

গ্রামবাংলার পথে-প্রান্তরে ক্ষেত-খামারে এ ধরনের অসংখ্য বিচিত্র জীবনের চরিত্র রয়েছে। দু'মুঠো অন্নের আকাঙ্ক্ষায় যে কৃষক উদয়াস্ত পরিশ্রম করে, চৈত্রের রোদে পুড়ে রুক্ষ ক্ষেত্রে লাঙ্গল টানে, বর্ষায়

বুক-সমান পানিতে ডুব দিয়ে পাট কাটে, শীতের প্রচণ্ড কাঁপুনি সত্য করে ফসল কাটে—তার জীবনসংগ্রাম কি অন্য যে কোনো সংগ্রামের চেয়ে কম মূল্যবান?

আমি জানি আমার গ্রামের সেই সুন্দর দিনগুলো আর কখনও ফিরে আসবে না। একে একে সব হারিয়ে গেছে। আমার সেই চিরচেনা গ্রাম, জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে জর্জরিত সেই মানুষগুলোও নেই। নেই মানুষের সেই মন-জীবন। যুদ্ধে সবাই যেন আজ পরাজিত। সেই কোমল সত্তারও মৃত্যু ঘটেছে। আজ শুধু বেঁচে থাকার প্রতিযোগিতা। আর তাই বেড়েছে স্বার্থপরতা, সংঘাত। হারিয়ে গেছে ভ্রাতৃত্ববোধ, সংকুচিত হয়েছে প্রসারিত হাত। জানি না এর শেষ কোথায়।

আমার জন্ম হয়েছে গ্রামে, শৈশবে রঙিন দিনগুলো উপভোগ করেছি গ্রামে। গ্রামীণ স্বভাব, চালচলন, জীবনযাত্রা ও মানসিকতার সঙ্গে আমার গভীর সম্পর্ক। এখনও একটু সময় ও সুযোগ পেলেই আমি হাঁপিয়ে উঠি বলেই গ্রামে চলে যাই। শহরের যান্ত্রিক ব্যস্ততম জীবন থেকে ছুটি নিয়ে গ্রামের নিরিবিলি নিঝুম শান্ত প্রকৃতিতে গেলে আমার দু'চোখে শান্তির ঘুম নেমে আসে। রাজধানীতে এমন ঘুম পাওয়া কষ্টকর। এখানে বাতাস খুব ভারি, শ্বাস নিতেই তো কষ্ট। রাতের তারাভরা খোলা আকাশ অনেক বড় সেখানে। নিম, কদম, তাল–নারিকেল গাছের পাতা ছুঁয়ে ছন্দময় শব্দ তুলে ছুটে আসে মুক্ত বাতাস। জীবনানন্দের 'রূপসী বাংলা' যেন আমার গ্রাম–ঘন সবুজ প্রকৃতি ও ফসলের প্রান্তর দেখে দু'চোখ জুড়িয়ে যায়। নির্জন দুপুরে ভেসে আসে ঘুঘু আর ডাহুকের ডাক, মাছরাঙ্গাটা টুপ করে ডুব দিয়ে নদী থেকে ঠিকই তুলে আনতে পারে মাছ। এর চেয়ে আর কোনো আকর্ষণ, মোহ, তৃপ্তি আর কোনো কিছুতেই নেই আমার। ধূলি-ধূসরিত গ্রামের জীবন আমার আজন্মের ভালোবাসা। আমার হৃদয়ের গভীরতম অনুভূতি।

রচনাকাল : ৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৬

প্রকাশিত : সাপ্তাহিক রোববার

বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সেনাবাহিনী

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু ছিলেন এদেশের প্রতিটি মানুষের অতি আপনজন। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণি, সম্প্রদায় নির্বিশেষে প্রত্যেক বাঙালির জন্যই ছিল তাঁর অকৃত্রিম দরদ। স্বাধীন বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর জন্য তাঁর স্নেহ ও দায়িত্ব কিছু কম ছিল না। যারা সেনাবাহিনীর প্রতি বঙ্গবন্ধুর দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে মিথ্যা অপপ্রচার চালাচ্ছেন তারা নিজেদের অসৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই সত্যকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করছেন। এই অশুভ শক্তির প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে সেনাবাহিনী নিয়ে একটা বিতর্কের সূত্রপাত করা। কিন্তু সেনাবাহিনীর সদস্য বা জনগণ কেউই তা চায় না। এতে শুধু সেনাবাহিনীর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হবে না, জনসাধারণের সাথে বিচ্ছিন্নতাও বেড়ে যাবে। সেনাবাহিনী নিয়ে যে কোনো ধরণের বিতর্কই দেশের জন্যও হবে আত্মঘাতী। জনগণের সাথে একাত্মতাবোধ নষ্ট হলে তাদের উপর অর্পিত দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও সংহতি রক্ষার পবিত্র দায়িত্ব পালন বিঘ্নিত হবে। জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন সেনাবাহিনী বহিঃশত্রুর আক্রমণের সহজ শিকারে পরিণত হয়। কোনো দেশপ্রেমিক সুস্থ মানুষই এ রকম অবস্থা কামনা করতে পারে না।

পাকিস্তান আমলে সেনাবাহিনী জনসাধারণের প্রতিপক্ষরূপে দাঁড়িয়েছিল। দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে সকল প্রস্তুতি ও জনসাধারণের উৎসাহ-উদ্দীপনাকে নস্যাৎ করে আটান্ন সালে সেনাবাহিনী রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে বসেছিল। গভীর রাতে ক্ষমতার হাতবদল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর চরিত্রকে করে তুলেছিল কলংকিত।

বেলুচিস্তানে বোমা ফেলে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে নির্যাতনের স্টিম রোলার চালিয়ে এবং সর্বোপরি বাংলাদেশের মানুষের অধিকার হরণ করে সেনাবাহিনী চূড়ান্তভাবে জনগণের প্রতিপক্ষরূপে দাঁড়িয়েছিল। সংঘাত ছিল যার স্বাভাবিক পরিণতি। আজও পর্যন্ত পাকিস্তানে সেই সংঘাতের অবসান ঘটেনি।

বাংলাদেশের সেনাবাহিনী গড়ে উঠেছে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রেক্ষাপটে। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ পাকিস্তানের অংশরূপে অন্তর্ভূক্ত হয়। কিন্তু অচিরেই বাংলাদেশ পাকিস্তানি শাসক-শোষকচক্রের বাজারে পরিণত হয়ে একটি নয়া উপনিবেশ হিসেবে গড়ে উঠল। তবে, এ অবস্থা প্রথম থেকেই চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ ভাষা আন্দোনের সূচনা হয়। আর এর থেকে শুরু হয় এক দীর্ঘস্থায়ী গণসংগ্রামের। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলন, ১৯৬৮ সালে আগরতলা মামলা-বিরোধী আন্দোলন, ১৯৬৯-এর ৬ দফা ও ১১ দফা ভিত্তিক আন্দোলন ও গণ-অভ্যুত্থান এবং ১৯৭০-এর নির্বাচন বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পরিপূর্ণ বিকাশের অভিযাত্রায় এক-একটি পতাকাচিহ্ন। এসব আন্দোলন আর সংগ্রামের স্তরে স্তরে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পাশাপাশি বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের ঘটে উত্তরণ। ১৯৭১-এর এসে তা চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, বাংলার জাতীয়তাবাদী আন্দোলন আর বাঙালি জনতা একীভূত হয়ে যায়।

আমাদের ইতিহাসের এ পর্যায়ক্রমিক ধাপে অন্যান্য দাবির পাশাপাশি পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও বেসামরিক চাকুরিতে বাঙালিদের অন্তর্ভূক্তি, পদোন্নতি ইত্যাদি প্রশ্নে যে বৈষম্যমুলক নীতি বিরাজ করছিল, তার বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধুই প্রথম থেকে ছিলেন সোচ্চার। আর এ কারণেই তাঁর ঐতিহাসিক ৬ দফা দাবিতে পূর্ববাংলার জন্য স্বতন্ত্র সেনাবাহিনী এবং নৌ সদর পূর্ব বাংলায় স্থাপনের দাবি উত্থাপন করা হয়েছিল। বাঙালির সেদিনের সংগ্রাম ও আন্দোলনে শেখ মুজিবের নেতৃত্ব যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছিল, সমগ্র জাতির মতোই তার সে

আবেদন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বাঙালি অফিসার ও জোয়ানদের মধ্যেও সাড়া জাগিয়েছিল অভূতপূর্ব। তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি ১৯৭১-এর রক্তে বান ডাকানো দিনগুলিতে। ২৫ মার্চের মধ্যরাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ল শান্তিপ্রিয় ও নিরস্ত্র বাঙালি জনগণের উপর। সে মুহূর্তেই বঙ্গবন্ধু তাঁর ৩২ নং ধানমন্ডি সড়কের বাড়ি থেকে ঘোষণা করলেন স্বাধীনতা। তিনি ডাক দিলেন সকল বাঙালিকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াই করে পাকিস্তানি হানাদারদের কবল থেকে দেশকে মুক্ত করতে। শুরু হয়ে গেল শসস্ত্র প্রতিরোধ ও যুদ্ধ। চট্টগ্রামসহ দেশের সর্বত্র বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা ও যুদ্ধের আহ্বান ওয়ারলেস যোগে পৌঁছে দেয়া হল। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে জনতা ও অন্যান্য আধা-সামরিক বাহিনীর বাঙালি অফিসার ও জোয়ান ভাইদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে আসলেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বাঙালি অফিসার ও জোয়ান ভাইয়েরা। আর এভাবেই সূচনা হল একটি নতুন দেশ ও একটি নতুন সশস্ত্র বাহিনী সৃষ্টির। বঙ্গবন্ধুর আহ্বান, জনগণের সক্রিয় সহযোগিতা ও নিজেদের দেশপ্রেমের জন্যই একটি শক্তিশালী বাহিনীর বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন করে গড়ে উঠতে পেরেছে আমাদের সেনাবাহিনী। বিজয়ী সৈনিকের উপযোগী স্বাধীন দেশের বাহিনী গড়ে তোলার জন্য তাই বঙ্গবন্ধু ও এদেশের জনগণ স্বাধীনতার পর সর্বাত্মক উদ্যোগ নিয়েছেন।

স্বাধীনতার পর সেনাবাহিনীকে আরো সুসংগটিত ও সুসজ্জিত করার জন্য জনসাধারণকে বহু ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। সংকুচিত করতে হয়েছে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের অনেক জরুরি কর্মসূচি। তবুও সেনাবাহিনীর চাহিদা মেটাতে কুণ্ঠিত হয়নি বাংলার মানুষ। মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা এই সেনাবাহিনীর প্রতি বঙ্গবন্ধু ছিলেন যেমনি স্নেহপ্রবণ তেমনি দায়িত্বসচেতন। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে তখন হাজার সমস্যা। হানাদার বাহিনী পিছু হটার সময় রাস্তাঘাট, রেলসেতু, ব্রিজ, কালভার্ট সব ভেঙ্গে দিয়ে গেছে। অকেজো করে দিয়েছে বন্দর। জ্বালিয়ে ফেলেছে অনেক শহর, গ্রাম। দেশের কলকারখানা প্রায় সব ক'টাই ছিল বিধ্বস্ত। কৃষিকাজও তখন প্রায় বন্ধ। তার উপর এক

কোটি শরণার্থীর সমস্যা। যুদ্ধে নিহত, আহত, ক্ষতিগ্রস্ত লক্ষ লক্ষ পরিবার। ঔপনিবেশিক শোষণের নিগড় থেকে মুক্তি পাওয়া সদ্য স্বাধীন একটি দেশের সম্পদ বলতে তখন শুধু মানুষের ঐক্য ও কর্মস্পৃহা। এরকম অবস্থায় বঙ্গবন্ধু হাত দেন দেশ পুনর্গঠনের কাজে। কিন্তু তাতেও সেনাবাহিনীর চাহিদা একটুকু খাটো করে দেখেননি তিনি। সেনাবাহিনীকে একটি আধুনিক ও শক্তিশালী বাহিনীরূপে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সরকার। ইনফ্যানট্রি, আর্টিলারি, সিগন্যাল, আর্মড, ইঞ্জিনিয়ার, মেডিকেল প্রভৃতি পূর্ণাঙ্গ রেজিমেন্ট ও ব্যাটেলিয়ান এবং আনুষঙ্গিক ইউনিটসহ তিনি সেনাবাহিনী গঠন করেছেন। প্রায় ৩০ হাজার সৈন্যের এই বাহিনী জন্মলগ্নেই সুসজ্জিতভাবে গড়ে উঠেছে। বঙ্গবন্ধুর পূর্ণ আন্তরিকতা ও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার ফলেই স্বাধীন বাংলাদেশে গড়ে উঠেছে সম্ভাবনাময় নৌ, বিমান ও পদাতিক বাহিনী।

দেশ তখন দুর্ভিক্ষের মুখোমুখি। বঙ্গবন্ধু হাঁপিয়ে উঠেছেন দশ কোটি মানুষের মুখে অন্ন তুলে দিতে। বাংলাদেশকে নিয়ে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রও তখন তুংগে। সেই সংকটের সময়ও বঙ্গবন্ধু ভুলে যাননি তাঁর প্রিয় সেনাবাহিনীর কথা। খাদ্য ক্রয়ের পাশাপাশি বিদেশ থেকে সেনাবাহিনীর জন্য সংগ্রহ করেছেন প্রয়োজনীয় অস্ত্রসম্ভার। যুগোশ্লাভিয়ায় সামরিক প্রতিনিধিদল পাঠিয়ে পদাতিক বাহিনীর জন্য আনা হয় ক্ষুদ্র অস্ত্রশস্ত্র এবং সাজোঁয়া বাহিনীর জন্য ভারী অস্ত্র। ভারতের অনুদান ৩০ কোটি টাকায় সেনাবাহিনীর জন্য কেনা হয় কাপড় ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি। সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে মিগ বিমান, হেলিকপ্টার ও পরিবহন বিমান। সে সময়ে মিগ-২১ই ছিল এই উপমহাদেশের সবচেয়ে আধুনিক বিমান। আজ পর্যন্ত তার সমকক্ষ কোনো জংগি বিমান আওয়ামী লীগ-পরবর্তী সরকারসমূহের পক্ষে সামরিক বাহিনীর জন্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। এছাড়াও বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত উদ্যোগের ফলেই মিসর থেকে আনা সম্ভব হয়েছে সাজোঁয়া গাড়ি বা ট্যাংক। উন্নত প্রযুক্তি ও উন্নত জ্ঞান লাভ করে দেশ যাতে আধুনিক সেনাবাহিনী গড়তে পারে সে উদ্দেশ্যে

বঙ্গবন্ধু অফিসারদের প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশে প্রেরণ করেন। বৃটেন, সোভিয়েত রাশিয়া, ভারত প্রভৃতি দেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন সেনাবাহিনীর অফিসাররা। জেনালের এরশাদ নিজেও সে সময় দিল্লিতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধুর সরকার সেনাবাহিনীর জন্য নগদ অর্থে আধুনিক বেতারযন্ত্র ক্রয় করেন এবং সিগন্যাল শাখাকে আরো আধুনিক করে গড়ে তোলেন। এভাবে স্বাধীনতা-উত্তর সময়ে অত্যন্ত সংকটজনক পরিস্থিতিতেও বঙ্গবন্ধু সেনাবাহিনীর প্রতি কোনো প্রকার অনীহা প্রকাশ করেনি। তিনি সামরিক একাডেমি স্থাপন করে আরও নতুন নতুন তেজোদীপ্ত তরুণের সমন্বয়ে সেনাবাহিনীকে উন্নত করার চেষ্টা করেছেন।

পাকিস্তান থেকে প্রত্যাবর্তনকারী আরো ত্রিশ হাজারের অধিক সামরিক কর্মকর্তা ও জওয়ানদের তিনি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে পুনর্বাসিত করেন। এ কাজ করতে গিয়ে বঙ্গবন্ধুকেও সমস্যায় পড়তে হয়েছে। তৎকালীন সেনাবাহিনীর অনেক কর্তাব্যক্তি এই পুনর্বাসনের বিরোধিতা করেছেন। অনেক জেনারেল বিভিন্ন সেনাছাউনিতে গিয়ে এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে বক্তৃতাও করেছেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু অত্যন্ত উদার ও যুক্তিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিলেন। এই প্রত্যাবর্তনকারী হাজার হাজার সৈনিক ছিল দেশেরই সন্তান। তারা দেশের শত্রু ছিল না। জাতির জনক হিসেবে তাদের প্রতি অনুদার ছিলেন না বঙ্গবন্ধু। তাছাড়া সেই মুহূর্তে সেনাবাহিনীকে গড়ে তোলার জন্য অভিজ্ঞতার প্রয়োজনও ছিল। দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞ ও উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এই সৈনিকদের সেনাবাহিনীতে গ্রহণ করাই বঙ্গবন্ধু যুক্তিসংগত মনে করেছেন। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে তখন ত্রিশ-চল্লিশ জন মাত্র কর্মকর্তা। আর প্রত্যাবর্তনকারী কর্মকর্তার সংখ্যা ছিল প্রায় তের শত। বঙ্গবন্ধু সেদিন অত্যন্ত সততার সঙ্গে সকল অফিসার ও জওয়ানদের নিয়ে অর্ধ লক্ষের অধিক সদস্যের সেনাবাহিনী গড়ে তুললেন।

বঙ্গবন্ধু সকলকে শুধু চাকরিতে পুনর্বাসনই করেননি, কমকর্তা ও সদস্যদের জন্য নির্ধারণ করেছেন পদোন্নতির প্রণালি। মুক্তিযুদ্ধ

চলাকালীন সময়ে ও পরবর্তীকালে সেনাবাহিনীর কর্মকর্তারা দ্রুত লাভ করেছেন। আজকের কর্মকর্তা ও সেনানায়কদের পদমর্যাদা লক্ষ্য করলেই এর সত্যতা মিলবে। বঙ্গবন্ধুর সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ছিল তাঁরই নিয়ন্ত্রণে। তিনি প্রত্যাবর্তনকারী কর্মকর্তা ও জওয়ানদের পাকিস্তানে বন্দি থাকাকালীন বেতন প্রদান করেন। সেনাবাহিনীর জন্য অস্ত্র, খাদ্য, পোশাক-পরিচ্ছদ সংগ্রহের জন্যই শুধু বঙ্গবন্ধু ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি, সেনা ছাউনির (ক্যান্টনমেন্ট) উন্নতি ও নতুন ছাউনি নির্মাণের পরিকল্পনাও গৃহীত হয় তখনই। পুরোনো ছাউনিগুলোতে নতুন নতুন ভবন নির্মাণের পরিকল্পনার সাথে নতুন ছাউনিও গড়ে ওঠে সারাদেশে। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে 'দিঘনালা', 'রুমা', 'আলিকদম'-এর মতো সামরিক গুরুত্বপুর্ণ ৩টি ছাউনি বঙ্গবন্ধুর নির্দেশেই গড়ে ওঠে।

বঙ্গবন্ধুর সরকারই প্রথম সেনাবাহিনীর সদস্যদের উপর যারা নির্ভরশীল তাদের রেশন নিকটস্থ সেনা ছাউনি থেকে নেয়ার ব্যবস্থা করেন। পূর্বে যারা সেনাবাহিনীর সদস্যদের সাথে ছাউনিতে অবস্থান করতেন তারাই শুধু এ সুযোগ লাভ করতেন।

জাতীয় রক্ষীবাহিনী গঠন ছিল বঙ্গবন্ধুর একটি সুদূরপ্রসারী চিন্তার ফল। অথচ এ নিয়েও এক শ্রেণির স্বার্থান্বেষী মহল অপপ্রচারের ঘোলাজলে মাছ শিকারে নেমেছিল। জাতীয় রক্ষীবাহিনী কোনোদিনই সামরিক বাহিনীর বিকল্প ছিল না। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মতো বাংলাদেশেরও প্যারামিলিশিয়া বাহিনী গঠনের প্রয়োজন ছিল। দেশের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের স্বার্থে ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু ঐতিহাসিক ৬ দফা দাবির মধ্যেই বাঙালির সামরিক স্বার্থের কথা উল্লেখ করেছেন। স্বাধীন দেশে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সমুন্নত রেখে জনগণের কল্যাণের জন্যই বঙ্গবন্ধু সেনাবাহিনী ও জনসাধারণের সহায়ক শক্তিরূপে জাতীয় রক্ষীবাহিনী গঠন করেন–যার সদস্যসংখ্যা ছিল সেনাবাহিনীর মাত্র ৬ ভাগের এক ভাগ। মুক্তিযোদ্ধাদের ফেরত দেয়া অস্ত্রেই শুধু তারা সজ্জিত ছিল। কোনো ব্যাটেলিয়ানেই ৬ থেকে ৭ টার বেশি হালকা মেশিনগান ছাড়া ভারী

অস্ত্র ছিল না। প্রশাসনিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে, আইন-শৃংখলা রক্ষায় ও সর্বোপরি সদ্য স্বাধীন দেশের উদ্ভূত পরিস্থিতিতে এ ধরনের বাহিনী গঠনের যৌক্তিকতা সারা বিশ্বে বিদ্যমান। সেভাবেই বঙ্গবন্ধুও গঠন করেছিলেন জাতীয় রক্ষীবাহিনী।

বঙ্গবন্ধু সামগ্রিকভাবে সেনাবাহিনী গঠন ও উন্নয়ন পরিকল্পনা করেছিলেন মাত্র সাড়ে তিন বছর সময়ের মধ্যে, যখন দেশ স্বাধীনতার ধকল সামলে উঠতেই হিমসিম খাচ্ছিল। অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও পুনর্বাসনের কাজই ছিল তখন জরুরি। তার মধ্যেও সেনাবাহিনীর কল্যাণ কার্যক্রম ব্যাহত হতে দেননি বঙ্গবন্ধু, অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়েছেন।

এদেশের সেনাবাহিনী তাই গড়ে উঠেছে জনসাধারণের স্বার্থত্যাগের বিনিময়ে, বঙ্গবন্ধুর গর্ব ও গৌরবের প্রতীক হিসেবে। সেই সেনাবাহিনী নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠবে এ কথা কল্পনা করাও ছিল কঠিন। তাই সত্য হয়েছে বাংলাদেশে।

জনগণের নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করে ক্ষমতা দখল করেছে সেনাবাহিনী। সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রে কিছু বিপথগামী উচ্চভিলাষী অফিসারের হাতে প্রাণ দিয়েছেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু এবং এই কুচক্রীরা জাতির জনককে হত্যার মাধ্যমে তাঁর অনুসৃত কর্মসূচিকে বানচাল করে বাংলাদেশে প্রগতির ধারা পাল্টে দেয়ার উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করেছে। একের পর এক নিজেদের ক্ষমতারোহণ, রাজনীতি, প্রশাসন, ব্যবসা-বাণিজ্য, দুর্নীতি প্রভৃতি সেনাবাহিনীকে অভ্যুত্থানকারীরা তাদের স্থায়ী বাহনে পরিণত করে চলেছে। এমনকি ক্ষমতালোভীরা সেনাবাহিনীর নামে হুমকি দিচ্ছে দেশের গণতন্ত্রকামী মানুষকে। সেনাবাহিনীর রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ন করে তাদের বার বার যুক্ত করা হচ্ছে সুবিধাবাদী সমাজবিরোধী ও অসৎ চরিত্রের ক্ষমতাশ্রয়ী সংগঠনের সাথে।

ক্ষমতাসীনরা উসকে দিচ্ছে রাজনৈতিক সংগঠনে কলহ বিভেদ। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার দিকে ঠেলে দিয়ে নেতা-কর্মীদের চরিত্র হননের অশুভ প্রক্রিয়ার সূচনাও করেছে দেশে। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর ক্ষমতার লোভে অভ্যুত্থানকারী ও তাদের

দোসররা সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করছে জনগণের প্রতিপক্ষরূপে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট এদেশে সূচনা করা হয়েছে হত্যার রাজনীতি। অন্যায়ভাবে অস্ত্রশক্তির মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে রাজনীতিতে আগত দুশ্চরিত্র কতিপয় ব্যক্তিকে নিয়ে ক্ষমতা ভাগাভাগির এক অশুভ প্রক্রিয়া চলছে। পর্যায়ক্রমে সেনাবাহিনীকে ব্যবহারের ধারাও এক্ষেত্রে অব্যাহত রয়েছে। ক্ষমতার লড়াইয়ে এক-একটি সামরিক অভ্যুত্থানে যেমনি প্রাণ দিতে হয়েছে বীর সৈনিকদের তেমনি সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক অধিকারের সংগ্রামে গত এক দশকে শহিদ হয়েছে বহু ছাত্র-জননেতৃবৃন্দ।

গত দশ বছরে দেশের অবস্থাও হয়েছে আরো সংকটাপন্ন। সামরিক শাসন বলবৎ থাকা সত্ত্বেও দ্রব্যমূল্যের সীমাহীন ঊর্ধ্বগতি জনজীবনকে যেমনি অস্থির করে তুলেছে। তেমনি নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, নারী ও শিশু-কিশোর হত্যা, খুন, ডাকাতি, ব্যাংকের টাকা লুট, ক্ষমতাসীনদের দুর্নীতি, সরকারি অর্থ অপব্যয় বেড়ে চলছে। বঙ্গবন্ধুর জাতীয়করণ, ভূমি সংস্কার, বৈদেশিক নীতি, সার্বজনীন শিক্ষার কর্মসূচি বিসর্জন দিয়ে আরো বৃদ্ধি করা হচ্ছে ধনী–দরিদ্রের পার্থক্য। ক্ষমতাসীনরা সামরিক বাহিনীর নাম ভাংগিয়ে সামরিক শাসনের যাঁতাকলে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিচ্ছে নির্যাতনের মুখে।

অথচ বঙ্গবন্ধুর কত গর্বই না ছিল এই সেনাবাহিনী নিয়ে। স্বাধীন বাংলাদেশের সেনাবাহিনী ছিল তাঁর স্বপ্নের বাস্তব রূপ। কুমিল্লার সামরিক একাডেমিতে প্রথম সমাপনী অনুষ্ঠানে ক্যাডেটদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছিলেন, "আমি বিশ্বাস করি পূর্ণ সুযোগ পেলে আমাদের ছেলেরা যে কোনো দেশের যে কোনো সৈনিকদের সাথে মোকাবিলা করতে পারবে, তাদের সে শক্তি আছে।" তিনি সেদিন তাদের প্রতি শৃংখলা ও জনসাধারণের প্রতি দায়িত্ব ও মমত্ববোধের আহ্বান জানিয়েছিলেন। কিন্তু বাস্তব কি নির্মম! জাতির জনকের হত্যাকারী হিসেবে চিহ্নিত তাঁরই প্রিয় সেনাবাহিনী! কিন্তু আমি বিশ্বাস করি সমগ্র সেনাবাহিনী এই হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত নয়। অথচ ১৫ আগস্টের

হত্যার দায়িত্বের বোঝা তাদের বয়ে বেড়াতে হচ্ছে। ক্ষমতাসীনচক্র খুনীদের বিদেশি দূতাবাসে চাকরি দিয়ে তাদের পুরস্কৃত করেছে। বঙ্গবন্ধুর হত্যার বিচার আজও হয়নি বলেই হত্যার দায়িত্ব সেনাবাহিনীর কাঁধে চেপে আছে। সেনাবাহিনীর শৃংখলার কারণেও এই হত্যাকাণ্ডের বিচার বাঞ্ছনীয় ছিল। আসলে ক্ষমতাসীনরা সেনাবাহিনীকে ক্ষমতা দখলের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের কারণেই খুনীদের বিচার করতে চায় না। সেনাবাহিনীর উপর এই দায়িত্ব চাপিয়ে রাখতে চায়। এইসব ক্ষমতালোভী সেনানায়করা কথার চমক দিয়ে সেনাবাহিনীকে বিভ্রান্ত করতে চাইছে। তারা রাষ্ট্র পরিচালনায় সেনাবাহিনীর অংশীদারিত্বের প্রশ্ন তুলেছে এই বিভ্রান্তি আরো বাড়িয়ে তোলার জন্য। সংবিধানে সেনাবাহিনীর ভূমিকা সম্পর্কে সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। দেশরক্ষা, দেশের উন্নয়ন, দুর্যোগকালে সহায়তা—এই সকল ক্ষেত্রেও সেনাবাহিনীর সাথে জনগণের সম্পর্কের মাপকাঠি। অথচ উচ্চাভিলাষীরা সমঝোতা ও ভ্রাতৃত্বের সাংবিধানিক সেতু ভেঙে জনগণ ও সৈনিকদের মধ্যে প্রতিপক্ষ চেতনার স্থায়ী সংঘর্ষ বাধিয়ে ক্ষমতা ভোগ করতে চায়। ১৫ আগস্টের পর যেমনি জনগণ হারিয়েছে গণতান্ত্রিক অধিকার, দেশে বৃদ্ধি পেয়েছে সংকট—ঠিক তেমনি সেনাবাহিনীর সম্মান ক্ষুণ্ন হয়েছে, তাদের করে তোলা হয়েছে বিতর্কিত। এই অবস্থা দেশের জন্য কিছুতেই কল্যাণকর হবে না। ধুরন্ধর ক্ষমতালোভীরা সৈনিক ও জনতার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে সেনাবাহিনী ও জনগণের উপর কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব চালিয়ে যাচ্ছে গত দশ বছর ধরে।

সেনাবাহিনী জনগণের পবিত্র আমানত। তারা দেশ রক্ষা করবে, দেশ শাসন করা তাদের দায়িত্ব নয়। আমি স্পষ্টই মনে করি রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ সৈনিকদের নৈতিক উন্নতি ব্যাহত করে ও দেশবাসীর সাথে সম্পর্কের অবনতি ঘটায়। বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে আজ দেশে সামরিক শাসন স্থায়ী করার যে কৌশল অবলম্বন করা হচ্ছে সর্বনাশের পথই সুগম হবে। ক্ষমতার স্বার্থে সেনাবাহিনীর সদস্যদের মধ্যে বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগ সম্পর্কে অপপ্রচার চালানো

হচ্ছে। এ কাজ কারো জন্যই শুভ নয়। বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সরকার অত্যন্ত কষ্টকর সময়ে দেশবাসীর অপরিসীম ত্যাগের বিনিময়ে এই সেনাবাহিনী গড়ে তুলেছেন এবং তার শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছেন। আওয়ামী লীগের সংগ্রাম সামরিক শাসনের পরিবর্তে গণতন্ত্র অর্জনের স্বপক্ষে। সামরিক ও বেসামরিক যে ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী আজ ব্যক্তিস্বার্থে জাতীয় সেনাবাহনীকে ব্যবহার করছে তাদের বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রামের নেতৃত্ব দিচ্ছে বঙ্গবন্ধুর সংগঠন আওয়ামী লীগ। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সুহৃদ সহযোদ্ধা সেনাবাহিনীর ভাবমূর্তি কোনো দেশপ্রেমিক নাগরিকই ক্ষুণ্ন হতে দিতে চায় না; বঙ্গবন্ধুর কন্যা হিসেবে আমারও তা কাম্য নয়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েমের মাধ্যমে এদেশে সেনাবাহিনী তার যোগ্য মর্যাদা পাবে এই প্রত্যাশা দেশবাসীর সাথে আমারও রয়েছে। সেনাবাহিনী জাতির প্রতিবন্ধক নয়; ক্ষমতালোভীদের উচ্চাভিলাষই হচ্ছে সকল প্রতিবন্ধকতার উৎস। বঙ্গবন্ধু তাঁর সৈনিকদের বলেছিলেন, "তোমাদের মধ্যে যেন পাকিস্তানি মনোভাব না আসে।... তোমরা হবে আমাদের জনগণের বাহিনী... তোমরা ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়াবে। যেখানে অন্যায়-অবিচার দেখবে, সেখানে চরম আঘাত হানবে।" বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে অসৎ উদ্দেশ্যে যারা ক্ষমতার উচ্চাশায় উন্মাদ হয়ে সামরিক শাসনের চক্রান্তে জনগণের গণতান্ত্রিক ক্ষমতাকে বন্দি করেছে, তাদের হাত থেকে ক্ষমতা উদ্ধার বঙ্গবন্ধুর তিল তিল শ্রমে গড়া সেনাবাহিনীর নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন সমুন্নত থাকবে, এই প্রত্যাশা আমারও রয়েছে।

রচনাকাল : আগস্ট, ১৯৮৩

প্রকাশিত : আমি তোমাদেরই লোক (সংকলন)

রাষ্ট্রীয় ধর্ম কার স্বার্থে

ইসলাম শান্তির ধর্ম। ইসলাম সাম্যের ধর্ম। প্রকৃত ইসলাম ধর্মে যারা বিশ্বাসী তারা কখনও জনগণকে শোষণ করতে পারে না। ইসলামের পরিপন্থি কোনো নীতিহীন আদর্শকেও তারা অনুসরণ করতে পারে না।

কোরান শরীফের বিভিন্ন জায়গায় বারবার শান্তির কথা উল্লেখ করা আছে, সাম্যের কথা আছে—ভ্রাতৃত্বের কথা আছে। সুরা কাফেরুনে স্পষ্ট লেখা আছে 'লা কুম দ্বীনো কুম ওয়ালিয়া দ্বীন'।

আমরা যদি বিশ্বাস করি, এই পৃথিবী আল্লাহ পাকের ইশারা ছাড়া চলে না। তাহলে এর ভালোমন্দ সবই তাঁর সৃষ্টি। খোদার ওপর খোদকারী করা চলে না। শেষ-বিচারের ভার তো তিনিই নিয়েছেন, মানুষের ওপর ছেড়ে দেননি। শেষ-বিচারের দিনে কোনো রাষ্ট্রপ্রধান দিয়ে দেশবাসীর জন্য ওকালতি চলবে না বা সে নিয়ম-রীতিও ইসলাম ধর্মে নেই। কাজেই রাষ্ট্রীয় ধর্ম ঘোষণার কোনো অর্থ হয় না। আমরা যারা এই পৃথিবীতে রয়েছি, তাদের নিজ নিজ কাজের হিসেব নিজেকেই খোদার কাছে দিতে হবে। রাষ্ট্রীয় ধর্মের প্রবক্তা এজন্য কোনো দায়দায়িত্ব গ্রহণ করবে না।

ধর্মনিরপেক্ষতার অমর বাণীও পবিত্র কোরান শরীফ থেকেই আমরা পাই। ধর্মকে ব্যক্তিগত স্বার্থে বিশেষ এক শ্রেণি ব্যবহার করে থাকে। কেউ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় পাকাপোক্ত হয়ে বসার জন্য, কেউ ক্ষমতায় যাবার জন্য ব্যবহার করে থাকে। যারা প্রকৃত মুসলমান, যারা

মন-প্রাণ সঁপে দিয়ে খোদার ইবাদত করে তারা কখনও তারস্বরে প্রচার করে বেড়ায় না। এ হলো সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত অনুভূতি ও বিশ্বাস। এর মাহাত্ম্য প্রচারযোগ্য। কিন্তু তাই বলে কোনো ব্যক্তিবিশেষ যদি টেলিভিশন ও পত্রিকায় এবং মসজিদে দাঁড়িয়ে নির্বিচারে মিথ্যা কথা প্রচার বা আত্মপ্রচারের জন্য ধর্মকে ব্যবহার করে, তবে তা ধর্মের প্রতি অবমাননা ছাড়া কিছুই নয়। ধর্ম নিয়ে কোনো জরবদস্তি করা ইসলাম-বিরোধী। ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় অনুভূতিতে কখনই আঘাত করাও উচিত নয়। রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে এমন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত নয় যা অন্য ধর্মাবলম্বীদের জীবনযাত্রা বা অনুভূতিতে আঘাত হানতে পারে। এটা সম্পূর্ণ ইসলাম-পরিপন্থি।

ইসলাম মানবতাবাদী ধর্ম। শান্তি ও মৈত্রীর অমর বাণী ইসলামের মূল কথা। ইসলাম উদার ধর্ম। এখানে সংকীর্ণতার কোনো স্থান নেই। যে ইসলাম ধর্মের আদর্শকে সমুন্নত রেখে, অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উদীপ্ত হয়ে বাংলার মানুষ মুক্তিযুদ্ধ করেছে, মুক্তিযুদ্ধের সেই চেতনাকে মুছে ফেলার জন্য এবং ব্যক্তিস্বার্থ টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে ইসলামকেই রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে ঘোষণা করার এক অশুভ তৎপরতা শুরু হয়েছে।

এই উদ্দেশ্যে কিছুকাল আগে সংবিধানের প্রারম্ভে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' সংযোজন করা হয়েছে। মুসলমান মাত্রই যে কোনো কাজ শুরু করার আগে মনে মনে 'বিসমিল্লাহ' বলে কাজ শুরু করে থাকেন। ধর্মীয় অনুভূতি ও নিয়ম হিসেবে তারা এটা করে থাকেন। এটাকে ঘটা করে বা ফলাও করে উচ্চারণের মাধ্যমে স্মরণ করা অর্থই ধর্মীয় অনুভূমিকে অবমাননা করা। যিনি মুসলমান, তাকে মনে করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন নেই যে তিনি মুসলমান।

শুধু তাই নয়, সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপনের প্রয়াস থেকে বাঙালির পরিবর্তে 'বাংলাদেশী' শব্দের আবির্ভাবও ঘটেছে এই তথাকথিত মহলবিশেষের পক্ষ থেকে। গণবিরোধী শাসকবর্গ

সবসময়ই ক্ষমতার ভিত দুর্বল থাকে বলে সরলপ্রাণ মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিকে ব্যবহার করে ক্ষমতার মসনদ পাকাপোক্ত করতে চায়। ওদের প্রতিটি পদক্ষেপ হচ্ছে ক্ষমতার উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করবার জন্য, ক্ষমতার অপব্যবহার করে রাষ্ট্রীয় অর্থ-সম্পদ ব্যক্তিগতভাবে কুক্ষিগত করা ও লুটপাটের রাজত্ব কায়েম করা। পাকিস্তানি সামরিক শাসকগোষ্ঠী এভাবেই দেশকে শাসন–শোষণ করেছিল।

আমাদের দেশে বাংলায় কথা বলেন না এমন নাগরিকও আছেন। এরা ভারত থেকে দেশ বিভাগের সময় ভারতীয় নাগরিকত্ব ছেড়ে এসে পাকিস্তানের নাগরিকত্ব গ্রহণ করে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে বসবাস শুরু করেন। এর মধ্যে অনেকে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানে চলে যায়। পরে পাকিস্তানের নাগরিকত্ব গ্রহণ করে। এরকম বহু অবাঙালি ও কিছু উচ্ছিষ্টভোগী বাঙালি যারা সব সময় পাকিস্তানি সামরিক শাসকদের পদলেহন করেছে, দীর্ঘ তেইশ বছরের স্বৈরাচার-বিরোধী আন্দোলনে গণবিরোধী ভূমিকা পালন করেছে—তারাই আবার একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি সেনা হানাদার বাহিনীর অন্যতম প্রধান সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। তাদের সঙ্গী সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী ধর্ম ও মসজিদকে রাজনীতির ঊর্ধ্বে না রেখে ব্যক্তিগত রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করবার জন্য ধর্ম ও মসজিদকেই ব্যবহার করেছে। এ অতি পরিচিত খেলা।

১৯৭৬ সাল থেকেই এদের পুনর্বাসনের কাজ শুরু হয়। 'বাঙালি' শব্দ বাদ দিয়ে 'বাংলাদেশী' করে এদের ফেরত আনা শুরু হয়। সম্পত্তি ফেরত নেবার কাজও শুরু হয়। বাংলাদেশী হলো Made in Bangladesh অথবা Product of Bangladesh. আর আমরা অথবা বাঙালি জাতি হিসেবে একটি দুর্ধর্ষ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ অর্জন করেছি। বাঙালি জাতীয়তাবাদ এবং মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্পূর্ণরূপে যারা মুছে ফেলতে চায়, তাদের মনে রাখা উচিত বাঙালি হিসেবে আমরা সংগ্রাম

করেছি—যুদ্ধ করেছি, যুদ্ধ জয় করেছি, ইতিহাসের পাতায় রয়েছে আমাদের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয়।

উল্লেখ্য যে, পরিত্যক্ত শিল্প-কারখানা রাষ্ট্রায়ত্ত করে নেয়া হয় স্বাধীনতার অব্যবহিত পর। আওয়ামী লীগ সরকার অনেক কষ্ট করে এসব ধ্বংসপ্রায় শিল্প-কারখানা ও ব্যাংক-বীমা চালু করে এবং সরকারি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসে ধীরে ধীরে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করে। বসতবাড়িগুলো শহিদ ও পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা পরিবার এবং শহিদ বুদ্ধিজীবী পরিবারকে দেয়া হয়। অনেক বাড়িঘর মাতৃসদন আর হাতপাতালে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু ১৯৭৬ সালের পর থেকে তথাকথিত 'বাংলাদেশী'দের কাছে এসব বাড়িঘর ফিরিয়ে দেবার হীন উদ্দেশ্যে শহিদ পরিবারদের উৎখাত করা হয়। সরকারি লোক দিয়ে তাদের মালপত্র রাস্তায় ফেলে দেয়া হয়।

শহিদ সাংবাদিক সিরাজদ্দীন হোসেন ও শহিদ সঙ্গীতকার আলতাফ মাহমুদসহ বহু পরিবারকে কী নিদারুণ পরিস্থিতির সম্মুখীনই না হতে হয়েছে, তা আমরা সকলেই জানি। অথচ পাকিস্তান থেকে ফেরত আসা অনেক বাঙালি তাদের সহায়-সম্পত্তি সেখানে ফেলে এসেছেন; সেগুলো ফেরত পাবার জন্য কোনো দাবি তোলা হচ্ছে না।

আমাদের দেশের কোটি কোটি টাকার পাওনা পর্যন্ত ফেরত আনার ব্যাপারে এদের নীরব ভূমিকা দেখে এদের প্রতি ধিক্কার ছাড়া আর কিছুই জানানো যায় না। এমনই পাক-প্রেমী এরা যে নিজের দেশের পাওনাটুকুর দাবি তোলে না।

বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের যে যুক্তিই তারা দেখান না কেন তা অত্যন্ত খোঁড়া যুক্তি বলেই আমি মনে করি।

আমাদের জাতিগত কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধারায় আমরা বাঙালি হিসেবে পরিচিত, প্রতিষ্ঠিত। আমাদের ভাষা, সাহিত্য-শিল্প, আচার-পদ্ধতি, জীবনযাত্রা, পোশাক-পরিচ্ছদ, চালচলন, সামাজিক রীতিনীতি—সবকিছু মিলিয়ে আমাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও চরিত্র নিয়ে

আমাদের যে বহিঃপ্রকাশ ঘটে সেটাই আমাদের জাতীয়তাবাদ। বাঙালি হিসেবে আমাদের হাজার বছরের গৌরবময় ইতিহাস ও ঐতিহ্য রয়েছে। আমাদের উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা বাঙালি। বাঙালি হিসেবেই যুদ্ধ করে, জীবনপণ লড়াই করে স্বদেশের মানুষ যে স্বাধীনতার সূর্যকে ছিনিয়ে এনেছিল, যে ভৌগোলিক সীমারেখায় 'স্বাধীন সত্তা' হিসেবে যে স্থানে পৃথিবীর মানচিত্রে নিজেকে চিহ্নিত করে নিয়েছে সেই আমাদের বাংলাদেশ। এই ভৌগোলিক সীমারেখায় অবস্থানকারী নাগরিক নিজেকে বাংলাদেশী বলতে পারে, নাগরিক হিসেবে নিজেকে বাংলাদেশী বলা যায়। কিন্তু জাতি হিসেবে 'বাংলাদেশী' বলবার কোনো সুযোগ আছে বলে আমি মনে করি না। এটা অত্যন্ত ভুল সিদ্ধান্ত।

তারা যুক্তি দেখায় যারা অবাঙালি তারা নিজেদের কি পরিচয় দেবে? তারা তো ভাষাগতভাবে সংখ্যালঘু। যারা উপজাতীয় তাদের নিজস্ব ভাষায় কথা বলে, তারা কীভাবে নিজেদের বাঙালি হিসেবে পরিচয় দেবে? তাই জাতীয় সংহতি রক্ষার জন্য বাঙালি নয়, বাংলাদেশী প্রবর্তন করা হয়েছে।

এ যুক্তি কি গ্রহণযোগ্য? এটা তো সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সিদ্ধান্ত এবং কার স্বার্থ রক্ষার জন্য এই সিদ্ধান্ত সেটা দেশের মানুষ ভালোভাবে জানে। ১৯৭৫-এর পর এ নিয়ে কেন প্রশ্ন তোলা হয়েছিল? তার আগে তো এ ব্যাপারে কোনো সমস্যাই দেখা দেয়নি? আমাদের প্রতিবেশি রাষ্ট্রে বাংলা ভাষাভাষী বিপুল জনগোষ্ঠী রয়েছে। তারা নিজেদের 'ভারতীয়' হিসেবে পরিচয় দেয়। ভাষাগতভাবে যদিও তারা বাংলাভাষী, কিন্তু জাতি হিসেবে তারা ভারতীয়। ইংরেজি ভাষার জাতি হিসেবে ব্রিটিশরা ইংরেজ। আমেরিকানরাও ইংরেজি ভাষী, কিন্তু তারা ইংরেজ নয়। অস্ট্রেলিয়া কানাডাসহ বহু দেশে ইংরেজি ভাষার চল রয়েছে, কিন্তু তারা নিজেদের ইংরেজ বলে না।

আমরা জানি স্বাধীনতার পর থেকেই পরাজিত পাক-প্রেমীরা অত্যন্ত তৎপর ছিল। এখনও আছে। আন্তর্জাতিক শক্তিগুলোও

তৎপর। বাংলাদেশের স্বাধীনতা, বাঙালি জাতির বিজয় এরা কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি। 'জয় বাংলা' স্লোগানও এরা সহ্য করতে পারে না। অথচ কে না জানে যে জাতির সেই দুঃসময়ে 'জয় বাংলা' স্লোগান আমাদের চেতনাকে কতখানি উজ্জীবিত করে তুলত। আসলে এই স্লোগানের মধ্য দিয়ে বাঙালির জয় ও পাশাপাশি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর পরাজয় ঘোষিত হয়। এটা পাক-প্রেমীদের মনঃপুত হবার কথাও নয়। তাই তো 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ' নিষিদ্ধ হলো। 'বাংলাদেশ বেতার' হলো 'রেডিও বাংলাদেশ'।

এরা ক্ষমতা অর্জন করেছে বুলেটের সহায়তায়। হত্যা, ক্যু, পাল্টা ক্যু ও ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়ে। ক্ষমতা দখলের পর এরা বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাস, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ভাষা ও ইতিহাসকে বিসর্জন দিয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের জয়ের সব নিশানাকে মুছে দেবার প্রয়াসেই 'বাংলাদেশী' প্রবর্তন করা হয়। একদিকে বাঙালি বাদ দিয়ে বাংলাদেশী প্রবর্তন করা হয়েছে ভাষাগত বৈষম্য রক্ষার তাগিদে। ভাষাগত সংখ্যালঘুদের স্বার্থের কথা বিবেচনা করে যদি তারা উদারতার পরিচয় দিতে চায় ভালো কথা কিন্তু পাশাপাশি আরও একটি প্রশ্ন দানা বাঁধে, সেটা হলো—সংবিধানে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' লাগানো হয়েছে। আবার এখন রাষ্ট্রীয় ধর্ম ঘোষণার পাঁয়তারা চলছে, এটা কোন যুক্তিতে?

এদেশে যেমন বিভিন্ন ভাষাভাষী রয়েছে তেমনি বিভিন্ন ধর্মের নাগরিক রয়েছে। মুসলমান, হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ ও উপজাতীয়রা সব মিলিয়ে প্রায় আঠারো ধরনের উপজাতীয় এদেশে বসবাস করে। তাদের ধর্মীয় রীতিনীতিতে ভিন্নতা রয়েছে।

সংবিধান রাষ্ট্রের পবিত্র আমানত। দেশ ও জাতির দিকনির্দেশনা কি হবে, সরকারি কাঠামো ও আইন, অর্থনৈতিক নীতিমালা, সামাজিক আইন-কানুন ইত্যাদি সর্ববিষয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার মূল দলিল হচ্ছে এই সংবিধান। দেশের সকল জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও ভাষাভাষী নাগরিকরা এ

সংবিধানকে মেনে চলতে বাধ্য। 'বিসমিল্লাহ' লাগানোর পর এখন প্রশ্ন—অন্য ধর্মাবলম্বীরা যখন সংবিধান পড়বে তখন কি ঐ অংশটুকু বাদ দিয়ে পড়বেন? তাদের ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে, বিশ্বাস থেকে, তারা কি এটা মানসিকভাবে গ্রহণ করতে পারবে? তবে কি সংবিধান তাদের জন্য প্রযোজ্য নয়? সংবিধান কি কেবল একটি ধর্মীয় গোষ্ঠীর জন্য প্রণীত হয়েছে, যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ? আপাতদৃষ্টিতে আমরা যদি বিশ্লেষণ করি সেটাই কি যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয় না? যে কোনো অরাজকতা, নিয়ম-ভঙ্গ তারা করতে পারেন? দেশে যে আইন-শৃংখলা ভঙ্গ হতে পারে এটা কি সংশ্লিষ্ট মহল ভেবে দেখেছেন?

ধর্মগত সংখ্যালঘিষ্ঠদের জন্য এসব তথাকথিত বাংলাদেশীদের কি কোনো দায়দায়িত্বই নেই? তারা কি এদেশের নাগরিক নয়? স্বাধীনতা যুদ্ধে এদের মা-বোন লাঞ্ছিত হয়েছে, এদের নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধে মুসলমান, হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ ও উপজাতীয়রা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একসঙ্গে যুদ্ধ করে বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দেশকে স্বাধীন করেছে। তাই তাদের আত্মত্যাগকে যাতে কোনোদিন ছোট করে না দেখা হয় সেজন্য সংবিধানে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে স্বীকৃত হয়েছিল। সাম্প্রদায়িকতার বীজ সমূলে উৎপাটন করে যাতে কখনও কোনো বিষয় দাঙ্গার রূপ না নেয়, বরং পাশাপাশি ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ থেকে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করতে পারে তার জন্যই ধর্মনিরপেক্ষতা। কোন যুক্তিতে ধর্মনিরপেক্ষতা বাদ দেয়া হলো, সেটা তারা আজও স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করেনি। যারা স্বাধীনতা সংগ্রামে রক্ত দিল, তাদের এদেশে স্থান হলো কিন্তু সংবিধানে উল্লেখিত অধিকার কেড়ে নেয়া হলো। আর যারা গণহত্যার সহযোগী দালাল আলবদর-রাজাকার তাদের পুনর্বাসিত করা হলো 'বাংলাদেশী' পরিচয় দিয়ে।

ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ কি? এর অর্থ হলো সহনশীলতা—ধর্মহীনতা নয়। একের প্রতি অপরের সহনশীল থাকাটাই বড় উদারতার পরিচয়।

আধুনিক রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে শুধুমাত্র ধর্মের জনগোষ্ঠী নিয়ে যদি কোনো রাষ্ট্র গঠিত হয় সেখানে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু যে সব দেশে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী রয়েছে সেখানে রাষ্ট্রীয়ভাবে ধর্মবিধি প্রয়োগের অর্থ হলো, সংঘাত সৃষ্টির ব্যবস্থা করা। এই খেলায় এদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে, সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতির গৌরবময় বিজয় ইতিহাস ও ঐতিহ্য মুছে ফেলার অপচেষ্টায় পাকিস্তান–প্রেমিকরা সদা তৎপর। সমগ্র জাতিকে এই ধোঁকাবাজদের সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। দেশের মানুষকে শোষণ করবার জন্য তারা নিত্যনতুন কৌশল প্রয়োগ করে চলেছে। রাষ্ট্রীয় ধর্ম ঘোষণার পাঁয়তারা আর কিছুই নয়, বাঙালি জাতির পরিচয় ভুলিয়ে দিয়ে ক্ষমতার মসনদ আঁকড়ে ধরে শোষণের শাসন কায়েম রাখাটাই বর্তমানে এদের প্রধান ষড়যন্ত্র।

রচনাকাল : এপ্রিল ১৯৮৮

প্রকাশিত : সাপ্তাহিক রোববার

বন্যাদুর্গত মানুষের সঙ্গে

২০ আগস্ট টুঙ্গীপাড়া পৌঁছলাম। ভাদ্র মাস শুরু হয়ে গেছে। পঞ্জিকা মোতাবেক বর্ষাকাল হলো আষাঢ় শ্রাবণ। তবুও আমাদের দেশে ভাদ্র মাসেই সাধারণভাবে বন্যা হয়ে থাকে। আর অতিবৃষ্টি হলে তো কথাই নেই। বিশেষ করে গোপালগঞ্জ এলাকায় সব সময়ই ভাদ্র মাসে পানি আসে। স্বাভাবিক নিয়মে বন্যা মানুষের জীবনে তেমন একটা ভয়াবহ বিপর্যয় টেনে আনে না। আমি যখন টুঙ্গীপাড়া যাই তখন অনেক নদীর পানিই বেশ উঁচুতে। গ্রামের নিচু এলাকায় এবং বিভিন্ন গ্রামে পানি এসেছে। টুঙ্গীপাড়া উপজেলা সদর দফতর কোর্ট-কাছারি, স্টাফ কোয়ার্টার, অনেকগুলি দালানের নিচতলাও পানির নিচে। একদিন নৌকা করে কিছু জায়গা দেখেও এলাম। আমাদের বাড়িটা আদি বসতি; জায়গাটা বেশ উঁচু। বেশি বন্যা হলে উঠোনে পানি এলেও ঘরে কখনও পানি ওঠেনি। কয়েকটি গ্রামে গিয়ে জানলাম ঐসব গ্রাম থেকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় দেশ ত্যাগ করেছে। সেসব অঞ্চল থেকে এলাকাবাসীরা এসে আমাকে তাদের গ্রামে যেতে অনুরোধ করে। বিশেষ করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় চায় আমি তাদের এলাকায় যাই।

একবার যখন আসি চিন্তা-ভাবনা করেই আসি যে বেশ কিছুদিন গ্রামে থাকব। বাবার কবর সংস্কার করব এবং গ্রামের কিছু কাজ করব। সব সময়ই গ্রামবাসী স্থানীয় মুরুব্বীরা অভিযোগ করে থাকেন যে, গ্রামে এসেই হুট করে চলে যাই, তাদের কাছে থাকা হয় না ইত্যাদি।

এই মাটিতেই আমার জন্ম। এখানেই আমার শৈশব ও কৈশোরের বেশ কিছু সময় কেটেছে। এ ছাড়া শহরবাসী হবার পরও বছরে দুই-

তিনবার স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার সময় বাড়ি এসে ছুটি কাটান আমার নেশা ছিল। শহুরে চাকচিক্যময় পরিবেশ থেকে গ্রামের সহজ সরল শান্ত পরিবেশের আকর্ষণ সব সময়ই আমার কাছে বেশি। গ্রামে এসে মনে হয় আমি যেন বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতে পারি। ঠিক করে ফেলি প্রতিদিন এক একটা গ্রাম ঘুরব।

২২ তারিখ চিংগাড়ি গ্রামে যাই। পাটগাতি ইউনিয়নের এই গ্রামটিতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বেশি বাস করে। তাদের অনেক যুবক ছেলে ও পরিবার দেশ ত্যাগ করেছে এই কয়েক মাসে। সেখানে নারী পুরুষ যুবক বৃদ্ধ নির্বিশেষে সকলেই বুঝতে চায় এদেশে তারা বসবাস করতে পারবে কিনা। একটা আতংক তাদের মধ্যে রয়েছে দেখতে পেলাম। সেই গ্রামেই একজন একটা হাঁস-মুরগির খামার করেছিল। বন্যায় সব ভেসে গেছে দেখলাম। প্রকৃতির কাছে মানুষ কত অসহায় তা একবার বন্যায় প্রত্যক্ষ করেছি। শরীরটা বেশি ভালো ছিল না। চিংগাড়ি গ্রামে ছোট্ট জলচৌকিতে পা দিয়ে মঞ্চের বড় চৌকিতে উঠতে গিয়ে জলচৌকি উল্টে পড়ে যাই। চোখের কোণে কেটে যায়, ডান নাকের পাশেও কেটে যায়। বাঁ পাশের পাঁজরের হাড়ে ব্যথা পেয়ে বেশ কিছুদিন শয্যাশায়ী থাকতে হয়। গ্রামে ঘোরাঘুরি বন্ধ হয়ে যায়।

এর মধ্যে বাবার কবরের প্রাথমিক কাজ শেষ হয়ে গেছে। ২৮ তারিখ ঢাকার পথে রওয়ানা হই। কিন্তু গোপালগঞ্জ আসার পর দেখি সব রাস্তা বন্ধ। ব্রিজ ভেঙ্গে গেছে। মোল্লারহাট ফেরি বন্ধ, নদীর পানি বেড়েছে। ফেরিঘাট থেকে এত উপরে গাড়ি তোলা ও পারাপার করা কষ্টসাধ্য। তবে ফেরির কর্মচারী ও স্থানীয় লোকেরা অনেক কষ্ট করে প্রায় দু'ঘণ্টা নদীর পানির মধ্যে থেকে গাড়ি পার করে দিল। ওটাই ছিল ও যাত্রায় শেষ গাড়ি পারাপার। কোনোমতে খুলনায় পৌঁছলাম।

এদিকে বন্যার প্রবণতা শুরু হয়েছে। ঢাকায় ফেরার চেষ্টা করে ব্যর্থ হই। কোনো পথই নেই, সব পথ বন্ধ। ফোনে ঢাকার সঙ্গে আলাপ করলাম, টেলিফোনে লাইন পেতেও দারুণ কষ্ট হলো।

ত্রাণ কমিটি করে প্রতিটি ইউনিটকে কাজে নামার নির্দেশ দিলাম। ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধপত্র নিয়ে স্পিডবোটে খুলনা থেকে টুঙ্গীপাড়া

রওয়ানা হলাম। ডাক্তার আমাকে পূর্ণ বিশ্রাম নেবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। ভাবলাম টুঙ্গীপাড়ায় গিয়ে বিশ্রাম নেব।

২ সেপ্টেম্বর টুঙ্গীপাড়া পৌঁছলাম। সেখানে পানি বাড়তে শুরু করেছে। সেদিনই সন্ধ্যার মধ্যে আমাদের উঠোনে পানি উঠল দেখতে দেখতে সারা গ্রাম ডুবে গেল। প্রত্যেক ঘরে পানি। সারা রাত কেউ ঘুমুতে পারলাম না। সব মানুষ প্রথমে ঘরের মধ্যে চৌকি উঁচু করে থাকতে চেষ্টা করল।

৩ তারিখ স্পিড বোট নিয়ে বের হলাম বিভিন্ন গ্রামের মানুষের খোঁজখবর নিতে। ছাত্রলীগের ছেলেরাও কাজে নামল। নৌকা করে বিভিন্ন পরিবারকে স্কুলগুলিতে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করা হল। আমাদের ওখানে প্রশাসনিক কর্মকর্তারা যথেষ্ট সহানুভূতিশীল ছিলেন কিন্তু তাদের করবার মতো বেশি কিছু ছিল না। উপর থেকে খোঁজখবর বা সাহায্য না পাঠানোর কারণে তারাও যেন দারুণ অসহায় অবস্থার মধ্যেই পড়েছিল।

এদিকে পানির তোড় এত বেশি এবং এত দ্রুত বাড়ছে যে এক ইঞ্চি জায়গাও পাওয়া যাচ্ছে না। সকলে রাস্তার উপর আশ্রয় নিল। কয়েকটি গ্রাম ঘুরে একই অবস্থা দেখলাম। পরদিনও পানি বাড়ল। রেডক্রস হাসপাতাল ও সবগুলো স্কুলেই মানুষ আশ্রয় নিয়েছিল। সেগুলোও পানির নিচে চলে গেল। আমি হাসপাতালে গেলাম। সব জায়গায় পানি, রোগীদের বিছানার নিচে পানি। তাদের খাওয়া-দাওয়া, রান্না করা এক সমস্যা। সেই মুহূর্তে একজন মহিলা একটি মৃত ছেলে প্রসব করলেন। পানিতে আটকা পড়ে সময় মতো হাসপাতালে আসতে পারেন নাই। শিশুটি পৃথিবীর আলোবাতাস দেখতে পেল না। অনেকক্ষণ বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে থাকলাম। মায়ের চোখের কোণ বেয়ে পানি ঝরছে, তার প্রথম সন্তান। আস্তে করে হাত দিয়ে চোখের পানি মুছে দিয়ে বেরিয়ে এলাম। মনটা খুবই বিষণ্ন হয়ে গেল। চারিদিকে যেখানে অথৈ পানি সেখানে চোখের দু'ফোঁটা পানি মুছে কি আমি কোনো সমাধান দিতে পারব? সৃষ্টিকর্তাকে মনে মনে স্মরণ করলাম, কী লীলা তোমার, পানির কারণে সন্তান হারিয়েছে আবার চোখের পানিই ফেলছে। কী বিচিত্র খেলা!

গত কদিন ধরে বহু ঘরে চুলো জ্বলেনি, আগুন জ্বলেনি। পানির তীব্রতা সব ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সবাই ঘর সামলাতে ব্যস্ত। উপরে বৃষ্টি, জ্বালানির কোনো ব্যবস্থা নেই। এদিকে সরকারের কোনো সাড়াশব্দও নেই। নদীর পাড়ে যাদের বসতি তাদের অবস্থা আরও করুণ। যে কোনো মুহূর্তে ঘরবাড়ি ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে। নিজের শরীরের কথা ভুলেই গেছি, শুধু রাত্রে শুতে গেলেই ব্যথা বাড়ে, ঘুমাতে কষ্ট হয়। চেয়ারে বসেই বেশিরভাগ সময় কাটাই। কিন্তু অসহায় মানুষগুলো যখন এসে দাঁড়ায়, সাহায্য চায়, বসে থাকতে পারি না। নদীর পাড়ের বাড়িগুলিতে বেশি অসুবিধায় পড়েছে শিশু ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা। এদিকে স্পিড বোটে তেলের অভাব। এক মন্ত্রী গোপালগঞ্জ এসেছেন। সব তেল তারা আটক করেছে। অথচ ঐ পরিবারগুলিকে উদ্ধার করা নিতান্ত প্রয়োজন।

এদিকে হাতের অবস্থাও ভালো নয়। ধার পাওয়াও কষ্টকর। গোলা খুলে দেয়া হলো, যার যত ধান প্রয়োজন নিয়ে যাক। কিন্তু বিজলি নাই, ধান ভাঙ্গাতে পারবে না। আগুন নাই, রান্না করতে পারবে না। এর মধ্যে অবশ্য প্রথম থেকেই পাউরুটি, কয়েক হাজার করে প্রতিদিন তৈরি করে নৌকায় বিভিন্ন এলাকায় বিলানো শুরু হয়েছে। বাজারে পানি ওঠে যাওয়াতে রুটির পরিমাণ কমতে শুরু করল। চুলা সব পানির নিচে। ৫ তারিখ গোপালগঞ্জ শহরের মধ্যে পানি। স্পিড বোট নিয়ে শহর দিয়েই ঘোরাঘুরি করা যায়। সেখানে বিভিন্ন ত্রাণ শিবির ঘুরলাম। কিছু ওষুধ ও স্পিড বোটের জ্বালানি কিনলাম। টুঙ্গীপাড়া ফিরে এসে নদীর পাড়ের বাড়ি থেকে শিশু ও বৃদ্ধদের উদ্ধার করে পাশের জেলায় তাদের আত্মীয় বাড়িতে পৌঁছিয়ে দেবার ব্যবস্থা করলাম।

৬ তারিখে অনেকগুলি গ্রামে গেলাম। গ্রামের নাম ডুমুরিয়া, লেবুতলা, বাঁশবাড়িয়া, ঝনঝনিয়া, তরাইল ইত্যাদি। কখনও নৌকায়, কখনও পায়ে হেঁটে মানুষের কাছে পৌঁছতে চেষ্টা করেছি। ৭ তারিখে বিভিন্ন গ্রামে ঘুরে জানলাম, অনেক মানুষের মৃত্যুর খবর আসতে শুরু করছে, বিশেষ করে শিশু ও বৃদ্ধরা। সর্পদংশনে কয়েকজন মরা গেছে। সাপের উপদ্রব খুবই বেড়ে গেল। পানিতে

পড়েও কিছু বাচ্চা মারা যায়। ৭ তারিখে পাটগাতি ও বর্নি উপজেলার গিমাডাঙ্গা, পাট কোহানিয়া, গজালিয়া, মুন্সীর চর প্রভৃতি গ্রামে ঘুরেছি।

গোপালগঞ্জ বঙ্গবন্ধু মহাবিদ্যালয়ে ত্রাণ শিবির। বহু লোক সেখানে আশ্রয় নিয়েছে। সমগ্র গোপালগঞ্জ শহরে পানি। শহরের ভিতর দিয়ে নৌকা চলছে। আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে ত্রাণ শিবিরগুলিতে খিচুড়ি বিতরণ করা হচ্ছে। এর আগে একদিন এসে আমি সবগুলি শিবির ঘুরে গেছি। তখনও বন্যাত্রাণ পৌঁছায় নাই। মানুষের কাজকর্ম ও আয়ের উৎস সম্পূর্ণভাবে বন্ধ। অত্যন্ত দুরবস্থার মধ্য দিয়ে দিনাতিপাত করছে মানুষ। অল্প জায়গায় মানুষের গাদাগাদি।

১০ তারিখে আবার গোপালগঞ্জ গেলাম ওদিকের কিছু এলাকা ঘুরব বলে। তার আগে স্থানীয় ত্রাণ শিবিরগুলিতে খিচুড়ি বিলানো হয়েছিল। বহু পরিবার দীর্ঘদিন ভাত চোখে দেখে নাই। কয়েকটি ত্রাণ শিবিরে গেলাম। শরীর একটু প্রতিবাদ জানাচ্ছে, চলতে চাচ্ছে না বলে মনে হচ্ছে। ব্যথার ওষুধ সঙ্গেই আছে, প্রয়োজনে খেয়ে নিচ্ছি। বঙ্গবন্ধু মহাবিদ্যালয়ের ত্রাণ শিবিরে পৌঁছেছি। আমাদের স্থানীয় সংগঠনের পক্ষ থেকে খিচুড়ি পাক করা হয়েছে বন্যার্তদের মধ্যে বিলি করার জন্য। যাবার সাথে সাথে সাড়া পড়ে যায়। সবাই আমাকে একটু দেখতে চায়। এদের কাছে আমি 'রাজার' মেয়ে। আব্বাকে এরা অতিরিক্ত ভালোবাসে এবং সেই কারণে 'রাজা' বলে ডাকত। এই ডাকের সঙ্গে মিশে আছে সম্মান ও স্নেহ। একই ঘরে হাঁস মুরগি ছাগল ছেলেমেয়েসহ সব মানুষ ঠাসাঠাসি করে কোনোমতে দিন যাপন করছে। ওরই মধ্যে তারা জীবনযুদ্ধে ব্যস্ত। অনেক পরিবার গত কয়েকদিন ধরে রান্না করবার মতো সুযোগ পায় নাই। আমি ওখানে পৌঁছালে সকলেরই এক কথা 'আমরা কিছু চাই না, তুমি দেখতে আইছ আমরা তাতেই খুশি।" একজন মহিলা এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'মা তুমি এত কষ্ট করে আসছো কেন? আমাদের কপালে যা আছে হবে। তুমি বাড়ি ফিরা যাও, এত ঘুরলে তোমার শরীল নষ্ট হবে। সব হারাইছি তোমারে হারাইতে চাই না, আমাদের কথা বলার তয় আর কেউ থাকবে না।" এরকম অনেক কথা তিনি

বললেন। মাথায় হাত বুলিয়ে দোয়া করলেন। তারপর দশ টাকার একটা নোট আমার হাতে খুঁজে দিলেন। আমার চোখে পানি এসে গেল। সত্যিই তো, আমিও তো সবই হারিয়েছি। আমি আমার স্নেহের ছোট্ট ছায়া হারিয়েছি, কিন্তু তার বিনিময়ে পেয়েছি বিশাল জগৎ। জানি না মহিলার সঙ্গে আবার আমার দেখা হবে কিনা। হলে কবে হবে! তবে তার দেয়া দশটা টাকা আমার কাছে দশ কোটি টাকার সমান। আমি আলাদা খামে তার টাকাটা রেখে দিয়েছি। গরিব মানুষ, আট সন্তানের জননী, স্বামীর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে। তার উপর এই বন্যায় আশ্রয়হীনা, তার মনের জোর অনুকরণযোগ্য, অবিশ্বাস্য। তার প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জানাই।

বর্নি এলাকার বৃদ্ধ রহিমা খাতুন রাস্তার উপর আশ্রয় নিয়েছেন। চোখে খুবই কম দেখেন। ডাটা ভাঙ্গা কালো ফ্রেমের চশমা। আমি গিয়েছি শুনেই লাঠি ভর দিয়ে এগিয়ে এলেন, "কই মা কই, ওরে আমারে একটু দেহা"। আমি কাছে গেলাম। তিনি আমার মাথা ও মুখে হাত বুলিয়ে অক্ষেপের সুরে বলতে লাগলেন, "বাবারে মারছে, আহা এমন মানুষটারে মাইরা ফ্যালালো, বিচারও করল না। খুনীগো বিচার করল না, তাই খোদার গজব আইছে। বান ডাকছে খোদার আরস কাঁইপ্যা গেছে।" বাঁশবাড়িয়োর রহিম শেখ, ক্ষেতে কাজ করেন। তাঁরও কথা—"বাবারে মারছে, বিচার করে নাই, খোদার গজব নাইম্যা আইছে।" পাঁচ কোহানিয়ার করিমুদ্দী বললেন আরো কথা— "এই পাপ সয় না। শুক্রবার জামাত অইল না। এতটুকু জায়গাও নাই নামাজ পড়বার। মসজিদ, মাদ্রাসা, স্কুল পানির নিচে।" এ ধরনের বহু উক্তি বিভিন্ন জায়গায় শুনতে পেলাম। জানি না কি দোষ করেছে এই গরিব পোড়খাওয়া মানুষজন।

জলিরপাড় ব্রিজ, ভেন্নাবাড়ি ব্রিজ, গান্ধিয়াসুর ব্রিজ, উলপুর ব্রিজ এবং সাতপাড়, বোলতলীসহ বিভিন্ন এলাকায় যাই। উপরোল্লোখিত ব্রিজ ও স্থানগুলি ভেঙ্গে যায়। ভেন্নাবাড়ির স্কুলটা সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হয়ে যায়। বহু গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়ে পড়ে। ফসলের জমিতে বালি পড়ে চাষের উপযোগিতা হারায়। সমস্ত ধান নষ্ট হয়ে যায়। টেকেরহাট থেকে গোপালগঞ্জ যাবার রাস্তাটা পাঁচটি জায়গায় ভেঙ্গে যাবার ফলে

রাজধানীর সঙ্গে গোপালগঞ্জের যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। মানিকছারা, লতিফপুর, ভেরারহাট, ভুতবাড়িয়া গ্রাম, পাইককান্দি ইউনিয়ন সি এণ্ড বি রাস্তার উপর আশ্রয়প্রাপ্ত মানুষদের সঙ্গে দেখা করি। বোরশি বঙ্গবন্ধু স্কুল এবং বেতগ্রাম দুর্গাপুরসহ বিভিন্ন জায়গায় মানুষের সঙ্গে দেখা করি। এলাকায় বিভিন্ন জায়গায় মানুষ একটা কথা বারবার বলে, "এল খোদার গজব। আমাদের রাজাকে মারছে, এমন ভাল মানুষটাকে মারল, আমাদের দরদীকে মারল, তার বিচার করল না, আল্লাহ গজব দিছে।"

ঘরের ভিতরে মাচা বেঁধে বসবাস করছে সিরাজের মা, হঠাৎ দেখে পানির মধ্যে কি যেন নড়াচড়া করে। ফিরে তাকাতেই চোখে চোখ পড়ল, 'ওরে বাবারে এইটা কি' বলে মাচা থেকে লাফ দিয়ে পড়ল ঘরের বাইরে যাবার জন্য। ওদিকে পানির ভিতরে ছিল বড় এক কাতলা মাছ। মাচার উপরের বাসিন্দা যেই না ভয়ে পানিতে লাফ দিয়েছে, পানির বাসিন্দাও ভয় পেয়ে এক লাফে মাচার উপরে। ভেলায় করে মানুষ যাচ্ছে। হঠাৎ গোখরা সাপ উঠল ভেলার উপর। উঠেই ফোঁস করে ফণা তুলল। সে মানুষ আর করে কি? প্রাণের ভয়ে পানিতে ঝাঁপ। জীবনের প্রয়োজনে কার স্থান যে কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় কেউ সঠিক বলতে পারে না। প্রকৃতির খেলাই এমন, জীব-জানোয়ার শত্রু-মিত্র সব যেন একাকার।

এই বন্যায় অনেক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে। ফরিদপুর জেলার কৈজুরী ইউনিয়নের হারাকান্দি গ্রামের আব্দুর রহমান ছেলেমেয়ে নিয়ে ঘরের মধ্যে মাচা বেঁধে শুয়ে আছে। হঠাৎ পানিতে খলখলানি আওয়াজ। আব্দুর রহমান ভাবল নিশ্চয়ই কোনো বড় মাছ। কোচখানা নিয়ে জায়গা দেখে আঘাত করল। কয়েকটা ঝাঁকি দিয়ে স্থির হয়ে গেল জলের প্রাণীটা। রক্তে লাল হয়ে গেল জায়গাটা পানিতে নেমে মাছ তুলতে গিয়ে তুলে নিয়ে এল নিজের সন্তানের মৃত লাশ। ঘুমের মধ্যে শিশুটি পানিতে পড়ে গেলে মাছ মনে করে তাকে আঘাত করে তার পিতা। আজ সেই শিশুর পিতামাতা পাগলপ্রায়।

পশ্চিম গোপালগঞ্জের চন্দ্র দিঘলিয়া পর্যন্ত গেলাম। সেখানে এগার হাজার লোকের জন্য সরকারি ত্রাণ এসেছে—মাত্র দেড় টন চাল।

তাও আবার এতদিন পরে। ত্রাণ বিতরণ নিয়ে অনেক তেলেসমাতি কাণ্ড ঘটে গেছে। ১১ তারিখ গেলাম কাটাখাল দিয়ে টেকেরহাট। গোপালগঞ্জের রাস্তা ভাঙ্গা। সাতপাড়, জলিলপাড় ইত্যাদি বিস্তীর্ণ এলাকা পানির নিচে। মাঝে মাঝে রাস্তা ভেঙ্গেছে, মানুষ রাস্তার উপর আশ্রয় নিয়েছে। পানির গতির তীব্রতা এত বেশি যে স্রোতের তোড়ে আরো ভাঙ্গনের আশংকা রয়েছে। অনেক জায়গায় নেমে খোঁজখবর নিলাম। বোলতলতে নামলাম, সেখানে রিলিফ বিতরণ হচ্ছে। দুই হাজার লোক সেখানে আছে; ৬ টন চাল বিলি করা হচ্ছে। গতকাল চন্দ্র দিঘলিয়ায় ১১ হাজার মানুষের জন্য ছিল মাত্র দেড় টন চাল। এর অর্থ কি? এর অর্থ হচ্ছে, বোলতলীতে হেলিপ্যাড আছে, দেশি-বিদেশি বড় কর্তারা এখানেই আসেন। যাদের সরকার ত্রাণকার্য দেখাতে চান তাদের এখানেই আনা হয়। কাজেই এখানকার চাহিদাটা পুরণ রাখলে সততা বজায় রাখার চেষ্টা সফল হবে। এক বৃদ্ধা আমার কাছে অভিযোগ করলেন, রিলিফ লিস্টে তার নাম নেই। আমি কর্তৃপক্ষকে তার নাম লিখে নিতে অনুরোধ করায় তারা সঙ্গে সঙ্গে লিখে নেন।

প্রখর রৌদ্র, সর্বত্র পানি আর পানি। বন্যার সময় বাতাসে ধুলোবালি থাকে না বলে সূর্যের আলোর তীব্রতা বেশি থাকে। এ ক'দিন একটানা ঘুরে ঘুরে পাঁজরের ব্যথা বেড়ে গেল। মনে হচ্ছে ব্যথার ওষুধে আর কাজ দিচ্ছে না। বাড়ি ফিরে বিছানা ছেড়ে ওঠার ক্ষমতা থাকল না। এর মধ্যে অবশ্য পানি নামতে শুরু করেছে। আমাদের ঘরের মধ্যে প্রায় এক-দেড় ফুট পানি উঠেছিল। সেই পানি নেমে গেল। খুলনা থেকে আমাদের সংগঠন কিছু রিলিফ পৌঁছে দিয়ে গেল। সেগুলি কিছু টুঙ্গীপাড়া ও কিছু গোপালগঞ্জ পাঠালাম।

এদিকে চোর-ডাকাতের উপদ্রব দারুণভাবে বেড়ে গেল। অনেক জায়গা থেকে লুটপাটের খবরও পাওয়া গেছে। বাংলাদেশের যেখানেই বন্যা হয়েছে সেখানেই একই চিত্র। এবারের বন্যায় সব থেকে লক্ষণীয় সাধারণ মানুষের সহযোগিতা। যাদের সংসার সচ্ছলভাবে চলা দায় তারাও প্রতিদিন কিছু রুটি বানিয়ে মানুষের মাঝে বিলি করেছে। সবচেয়ে দুঃখজনক টুঙ্গীপাড়া উপজেলায় সরকারি বন্যাত্রাণ। সেখানে ৭ সেপ্টেম্বর তারিখ পৌঁছায় ৮ টিন বিস্কুট ও ৫টিন দুধ।

চালের খবর তো আগেই দিয়েছি, সিদ্ধিয়া ঘাট খাদ্য গুদামে বন্যার পানি ঢুকে গম পচে যায়। সেই গমই মানুষের মধ্যে বিলি করা হয়। সবচেয়ে ন্যক্কারজনক ঘটনা হলো ত্রাণমন্ত্রী ও জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ডাকবাংলাতে বসে শুধু মুরগি ধ্বংস করেছেন। আর সাংবাদিকরা তাদের ত্রাণকার্য পরিচালনার কভার কেন দিলেন না, তার জন্য তাদের গালিগালাজ করেছে। এবং একজন সাংবাদিকের ফোন লাইন কেটে দিয়েছে। দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় ১৪–৯-৮৮ তারিখে টেলিভিশনে মন্ত্রীদের "ত্রাণ তৎপরতার খবর নিষিদ্ধ" এই হেডিংয়ে যে খবরটা পরিবেশন করা হয়, তাতে দেখা যায়, টেলিভিশন ক্যামেরা যাবে না বলে মন্ত্রীরা পূর্ব নির্ধারিত ত্রাণ বণ্টন কর্মসূচি বাতিল করেছেন। হাজারীবাগের কোনো এক ত্রাণ শিবিরে আশ্রয়কারীরা বলেছে "ফটো তোলা শ্যাষ, রিলিপ দেওয়াও শ্যাষ" (সংবাদ, ২৬.৯.৮৮)

যারা ত্রাণ শিবিরে আসে তারা বাঁচতে চায়। সাধারণ মানুষ যদি ব্যাপকভাবে সাহায্যের হাত না বাড়াত, তবে কত মানুষ যে মৃত্যুবরণ করত, তার হিসাব নেই। "ছবি আর খবর তাহাদের কাছে অর্থহীন" (ইত্তেফাক, ৬.৯.৮৮) সত্যি তাই। তবে তাদের কাছে অর্থহীন হলে কি হবে, অনেকের কাছে অর্থবহ। দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের দুরবস্থার সুযোগে প্রতিদিন টেলিভিশন আর খবরের কাগজে ছবি ছাপাবার এবং ব্যক্তিগত ইমেজ বাড়াবার যে ব্যাপক সুযোগ খোদাতায়ালা করে দিয়েছেন, সেটা কি হাতছাড়া করা যায়?

এবারের বন্যায় মৃতের সংখ্যা কত? ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণই বা কি? না, সে তথ্য তুলে ধরা হচ্ছে না। বন্যার শুরুতে যেভাবে প্রচার হয়েছে সেভাবেই বিদেশ থেকে সাহায্য এসেছে। ত্রাণ তহবিলে টাকা জমা হয়েছে। এখন আবার দ্রুত সবকিছু ঠিকঠাক দেখাবার প্রবণতার পিছনে রহস্য কি? বন্যায় কারো সর্বনাশ, কারো পৌষ মাস। এবারের মৃতের সংখ্যা সঠিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে না। টুঙ্গীপাড়ায় সর্বমোট ১৪ জন মৃত্যুবরণ করে কিন্তু সরকারি হিসেবে বলা হচ্ছে মাত্র দুজন। অর্থাৎ সরকার যা দেখাবে তাকে ৭ দিয়ে গুণ করলেই শুধু সঠিক তথ্য পাওয়ার চেষ্টা করা যেতে পারে। জীবনের মূল্য এদের কাছে নেই।

যেখানেই গেলাম দেখলাম মানুষ মানবেতর জীবন যাপন করছে। সরকারের পক্ষ থেকে উদ্ধারকার্যও ঠিকমত করা হচ্ছে না।

গেপালগঞ্জের শাহপুর ইউনিয়নের চান দিঘির পাড়ের নারায়ণ রায় খেতে না পেয়ে মারা যায়। কচুরীর ধাপের উপর বন্যার সময় আশ্রয় নিয়েছিল নারায়ণ চন্দ্র। ভাতের অভাবে শাপলা ফুলের থেকে যে ফল হয়, তাকে ঢ্যাপ বলে, তাই খেয়ে দিনাতিপাত করছিল। এক সময় ঢ্যাপও ফুরিয়ে যায়। অনাহারে নারায়ণ মৃত্যুবরণ করে। তার কাছে কোনো ত্রাণ পৌঁছায়নি। জ্বালানি তেলের অভাবে বেসরকারি দলও তার কাছে পৌঁছতে পারে নাই। গ্রামবাংলার প্রত্যেক অঞ্চলে আরও কত এ ধরনের ঘটনা যে ছড়িয়ে আছে, কে তার খোঁজ রাখে। এ সমাজে মানুষের জীবনের কোনো মূল্য নাই। অবহেলা ও দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে জীবনযুদ্ধে এদেশের গ্রামের মানুষ প্রতিনিয়ত লড়াই করে ধুঁকে ধুঁকে মরে। জীবন দীপ এভাবে নিভে যাচ্ছে। এই সমাজের পরিবর্তন না হলে এই মানুষগুলিকে বাঁচান যাবে না। আমাদের যা কিছু সম্পদ তা সকলে মিলে ভোগ করলে সকলেই বাঁচতে পারত। কারও জীবন বিলাসিতার প্রবাহে প্লাবিত, কারও জীবন ধুঁকে ধুঁকে শেষ হয়ে যাচ্ছে অন্নের অভাবে। এই কি জীবন? স্থানীয় সংগঠন নিয়ে বসে, তাদের পরবর্তী কাজ বুঝিয়ে দিয়ে ১২ সেপ্টেম্বর ঢাকার পথে খুলনা রওয়ানা হলাম। বন্যার পানি তখন নামতে শুরু করছে। রাজধানীতে এসে পৌঁছলাম ১৫ সেপ্টেম্বর।

আমাদের দেশের ভৌগোলিক অবস্থানই বন্যার মূল কারণ। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনার অববাহিকায় আমাদের দেশ। পলিমাটির স্তর জমেই এই ভূখণ্ডের সৃষ্টি। আর এর অবস্থানটাও এমন যে, উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম বিস্তীর্ণ এলাকার বৃষ্টির পানি এবং হিমালয়ের বরফগলা পানি নেমে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে পড়ে আমাদের অঞ্চলের মধ্য দিয়ে। ব্রহ্মপুত্র উত্তর-পূর্ব অঞ্চল থেকে দক্ষিণ দিকে ধাবমান। গঙ্গাও উত্তর থেকে দক্ষিণে যাচ্ছে। আমাদের দেশে জুলাই, আগস্ট, সেপ্টেম্বর মোটামুটি বন্যার সময়। বাংলা আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র এই তিন মাস। এছাড়া সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসও মাঝে মাঝে আঘাত হানে। এ সময় বঙ্গোপসাগরের পানিও তিন-চার ফুট বেড়ে যায়। এছাড়া

প্রচুর ছোটখাটো শাখানদীও রয়েছে। প্রকৃতির কারণেই বন্যা হয়ে থাকে। আমি বিশেষজ্ঞ নই, কাজেই বেশি কিছু বলার মতো বিদ্যে আমার নেই। সেটা বিশেষজ্ঞরাই বলবেন। মোদ্দা কথায় বা সাধারণ জ্ঞানে আমি যেটুকু বুঝি বা কাগজপত্রে যা দেখি, তার থেকে কিছু জানার চেষ্টা করি।

১৯৫৪ সালেও এদেশে ভয়াবহ বন্যা হয়েছে। এ পর্যন্ত বত্রিশ-তেত্রিশ বার বন্যা হয়েছে। ১৯৭৪ সালেও ভয়াবহ বন্যা হয়। ১৯৫৪ সালে আসামে ভূমিকম্প হয়; তারপরও তীব্র বন্যা হয়। এবারেও নেপালে এবং বিহারে প্রথমে ভূমিকম্প হয়। তার পরই আসে এই বন্যা। নেপালে গাছ কেটে বন উজাড় করার ফলে উজানে পানির গতিরোধ করার প্রাকৃতিক ক্ষমতা কমে গেছে। অতি বৃষ্টিপাতের ফলেও নদীতে পানি বৃদ্ধি পায়।

বন্যার কারণ খুঁজেতে গেলে ১৯৫৪ ও ১৯৮৮ সালের আসামের ও নেপালের ভূমিকম্পের এই পটভূমিগত মিলটা মনে রাখা দরকার। হিমালয়ের বরফগলার সময়ও এবছর অতিক্রম করেছে এবং অতিরিক্ত পরিমাণে বরফ গলেছে। নদী দু ধরনের : বরফগলা নদী ও বৃষ্টিধোয়া নদী। বরফগলা নদী সাধারণত বারো মাস নাব্য থাকে। সেখানে পানির ধারণ ক্ষমতা নির্ধারিত। কাজেই অতিরিক্ত পানি হলেই তা আঘাত হানে; নদীতে পানি জমে পানি উপচে পড়ে।

বন্যা কেন হয়? আমরা বন্যা কখন বলি? যখন লোকালয়ে আঘাত হানে, জানমালের ক্ষতি করে তখনই বন্যা বলি। বিজ্ঞানের বিকাশের সাথে সাথে মানুষের জীবনযাত্রা আজ অনেক সহজ হয়েছে। কবে কি ঘটতে যাচ্ছে তার খবর পাওয়া মোটেই কঠিন নয়। এবারে যে বন্যা আসবে, ঢাকা শহরে নৌকা চলবে, নৌকা ছাড়া যে মানুষের কোনো গতি থাকবে না এটা সরকারি মহল আগেই জানতেন। ১৮ আগস্ট থেকে বন্যার খবর পুরোপুরি জানা থাকা সত্ত্বেও জনগণকে হুশিয়ার করে দেয়া হয়নি কেন? বুড়িগঙ্গার পানি ‘কত’ সেন্টিমিটার বাড়বে বা বিপদসীমার কত উপরে, কেবলমাত্র এইটুকু খবর পরিবেশন করলেই দায়িত্ব ফুরিয়ে গেল? পানির পরিমাণ বাড়লে পর জনগণের কি কি ক্ষতি হতে পারে, শহর বা গ্রামে কতদূর ডুবতে পারে— বা

নিম্নাঞ্চলের লোকদের সরিয়ে নেয়া, সরকারি গুদামের খাদ্যশস্য বাঁচাবার ব্যবস্থা নেয়া, এগুলি করা মোটেই কঠিন কাজ নয়। অবাক হয়ে যাই ভেবে যে সরকার কেন এই পদক্ষেপগুলি নেয়নি।

১৯৫৪ সাল থেকে এ পর্যন্ত বন্যায় ক্ষতি হয়েছে কয়েক লক্ষ হাজার কোটি টাকা। ১৯৫৪ সালের বন্যার পর ক্রুগ মিশন গঠিত হয়। ১৯৫৭ সালে ক্রুগ মিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এই রিপোর্টের সুপারিশের ভিত্তিতেই "ওয়াপদা" গঠিত হয়। যা পরে পানি উন্নয়ন বোর্ড ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড নামে পরিচিত হয়। নিয়মিত নদী খননের (ড্রেজিং) ব্যবস্থা নেয়া হয়। নদীর পাড়ে বাঁধ নির্মাণ ইত্যাদি ব্যবস্থা নেয়া হয়। কিন্তু ১৯৫৮ সালের শেষের দিকে সামরিক শাসন জারি হবার পর ধীরে ধীরে সবই বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৭৪ সালে আওয়ামী লীগ সরকার বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য কতকগুলি ফরমুলা প্রণয়ন করে। বন্যা সমস্যা সমাধানের সূত্রগুলি খুঁজে বের করবার চেষ্টা চালান হয় ও চিহ্নিত করা হয়।

হিমালয়ে পার্বত্য অঞ্চলে পানি রক্ষণাগার তৈরি, কয়েকটি নদীর পানিপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ, নদীতীরবর্তী স্থানে বাঁধ নির্মাণ, নিয়মিত নদীখনন—এসব বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়। সঙ্গে ড্রেজার কেনার চুক্তিও হয়েছিল। কিন্তু ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্টের পর সামরিক শাসন জারিতে সব পরিকল্পনা বন্ধ হয়ে যায়।

বন্যাপরবর্তী মানুষের অবস্থা আরো আশংকাজনক। এবার বন্যাকবলিত এলাকায় ফসল সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়েছে। এ সময় গ্রামগুলিতে সাধারণত ধান ওঠা ধান তোলা, ধান ভানা ইত্যাদি কাজ করে বহু মহিলা জীবিকা নির্বাহ করে। ধান কাটা, মাড়াই, খড় শুকান, পালা দেওয়া ইত্যাদি কাজ করে পুরুষরা বছরের খোরাকি কিছুটা হলেও পূরণ করে। এবার খেতের ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়ায় এই শ্রেণি একেবারেই বেকার হয়ে গেছে। ঘরবাড়ি নেই। যা আছে তাও মাটির সাথে মিশে গেছে। গ্রামের বিধবা মহিলারা তাদের সন্তানদের নিয়ে চরম বিপদে পড়েছে। এদের কাজের ব্যবস্থা অচিরেই করতে হবে, তা না হলে এর ধাক্কা সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর দারুণ প্রভাব ফেলবে। কৃষকদের বীজধান নষ্ট হয়েছে। ছোট বড় মাঝারি সব

ধরনের কৃষকরাই সমস্যার সম্মুখীন। অচিরেই এই সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজে পেতে হবে। কৃষকদের সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারকে সক্রিয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

বন্যা এবারেই শেষ নয়। আবার আসবে। হয়তো আরো ভয়াবহ রূপ নিয়ে আসতে পারে, আবার তা নাও হতে পারে। এক্ষেত্রে সরকারকে নির্লিপ্ত থাকলে চলবে না। দেশের মানুষকে বাঁচাতে হলে দেশের সম্পদ বাঁচাতে হবে। অপরকে দোষারোপ করে দায়দায়িত্ব এড়ান চলবে না। জাতি ক্ষমাও করবে না। বন্যার স্থায়ী সমাধান করতে হলে বাস্তবমুখী পরিকল্পনা নিতে হবে। এর মধ্যে কিছু হবে স্বল্পমেয়াদী, কিছু হবে দীর্ঘমেয়াদি। এছাড়া বন্যার পূর্বাভাস যাতে মানুষ পেতে পারে, তার ব্যবস্থা অবশ্যই নিতে হবে।

এবার সরকারের থেকেও বেশি তৎপর ছিল এদেশের সাধারণ মানুষ–সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, রাজনৈতিক দল, সামাজিক সংগঠন। প্রতিটি পরিবার সাহায্যে হাত বাড়িয়েছে। সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ। সরকারি ত্রাণ সাত দিনে পরিবারপ্রতি এক মুঠি চাল বা এক সের চাল দশ দিনে বণ্টন করেছে। তাতে মানুষ বাঁচে না। তাই যাতে বন্যা সমস্যার স্থায়ী সমাধান করা যায় তার পদক্ষেপ নিতে হবে। এজন্য রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি অবশ্যই থাকতে হবে। জাতির কাছে সরকারের রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি অবশ্যই থাকবে। তারাই কেবল আন্তরিক হবে এ-বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে। এটা আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা, অতীতের অভিজ্ঞতা। এছাড়া তথাকথিত শক্তিধরদের কাছ থেকে শুধু গালভরা বুলিও শুনতে হবে, আর অপরকে দোষ দিয়ে দায়দায়িত্ব এড়াবার সুযোগ সন্ধান করতে দেখা যাবে। এ অবস্থা থেকে জাতি মুক্তি চায়। বাঁচতে চায়। ভবিষ্যৎ বংশধরদেরও বাঁচাতে চায়।

রচনাকাল : অক্টোবর ১৯৮৮

প্রকাশিত : সাপ্তাহিক ঢাকা

নূর হোসেন

১০ নভেম্বর ১৯৮৭, ঢাকা অবরোধ দিবস। এক দফা অর্থাৎ জেনালের এরশাদের স্বৈরসরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করানোর লক্ষ্যে অবরোধ আন্দোলনের ডাক দেই। এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাংলার গ্রামে-গঞ্জেও 'চলো চলো, ঢাকা চলো' রব উঠলো। ভীত সরকার সরাসরি মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হবে আঁচ করে কাপুরুষের মতো ঢাকার প্রতিটি প্রবেশ–দ্বারে, রাস্তার মুখে পুলিশ-বিডিআর মোতায়েন করল– যাতে কেউ ঢাকায় প্রবেশ করতে না পারে। কিন্তু এ যৌবন জলতরঙ্গ রোধে সাধ্য কার? সপ্তাহ খানেক আগে থেকেই কৃষক-শ্রমিক-দিনমজুর, পেশাজীবী মানুষ, ছাত্র-রাজনৈতিক কর্মী যে যেভাবে পারছে ঢাকায় আসতে শুরু করেছে।

১৯৮৬ সালে নির্বাচনে এদেশের মানুষ তাদের রায় জানিয়েছিল। আওয়ামী লীগ ও পনেরো দলীয় জোটকে ভোট দিয়ে এই সরকারের পতন অনিবার্য করেছিল। কিন্তু অস্ত্র হাতে নিয়ে যড়যন্ত্র করে সেনাছাউনিতে বসে ক্ষমতায় আরোহণকারী চক্র লুঠতরাজ করা ও আখের গোছাবার স্পৃহা তাদের অন্যায় পথে ক্ষমতা পরিবর্তনের ধারা অবলম্বনের দিকে তাড়িত করে। সেনাছাউনিতে বসে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা বন্ধ করে দিয়ে ৪৮ ঘণ্টা ধরে ফলাফল পরিবর্তন করে পুনঃপ্রচার করে এবং নিজেদের জয়ী হিসেবে ঘোষণা দেয়। এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক ধারা প্রতিষ্ঠিত হবার যে সম্ভাবনা ছিল তা নস্যাৎ হয়ে যায়।

এই নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সদস্যদের মন্তব্য লক্ষণীয়। তারা এসেছিল নির্বাচন দেখতে। তারা তাদের

অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে গেছেন– From what we saw the principle offenders in rigging the elections were the jatya Party. They were responsible for turning what could and should have been an historic return to democricary in Bangladesh into a tragedy for `democracy'.

Lord Ennals. Mr. Martin Brandon-Braveo. M.P. and Mr. David Lay (B.B.C.) 8 May 1989

গণতন্ত্রের ঐতিহাসিক সম্ভাবনাকে যে ট্র্যাজেডিতে রূপান্তরিত করা হলো তার জন্য সরকারি দল জাতীয় পার্টির ব্যাপক কারচুপিই যে দায়ী তা ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সদস্যরা স্পষ্টভাবে বলেছেন।

ভোট ডাকাতি ও 'মিডিয়া ক্যু' অর্থাৎ ঘোষণার মধ্য দিয়ে ফলাফল পরিবর্তনের পরও ব্যাপক প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে যতটুকু ফলাফল আমরা বাঁচাতে পেরেছিলাম তা নিয়ে পার্লামেন্টে বসি। সেখানে গণবিরোধী বাজেট সংশোধনে সরকারকে বাধ্য করি যা অতীতে কখনও হয়নি। জাতীয় তদন্ত ও সমন্বয় বিল নামে অপর একটি গণবিরোধী বিলও পাশ করতে দেয়া হয়নি। এর পরই আনা হলো জনতার অধিকার হরণ ও প্রশাসনকে সামরিকীকরণের জেলা পরিষদ বিল। ব্যাপক প্রতিবাদের মুখেও পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী এই বিল মাত্র চার মিনিটেরও কম সময়ে পাশ বলে ঘোষণা দেয়া হল। পার্লামেন্টের সকল রীতিনীতি ভঙ্গ করা হলো।

সরকারি আচরণের একটা বিষয় সুস্পষ্ট যে আমরা পার্লামেন্টে থাকতে তাদের তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। সরকারের মুখোশও ধীরে ধীরে খুলে যাচ্ছিল।, তাতে এই পার্লামেন্টে তাদের কাছে অসহনীয় হয়ে উঠছিল। আমরা এই বিলের প্রতিবাদে ওয়াক আউট করি এবং আন্দোলনের ডাক দেই।

সে সময় অবশ্য আমাদের জোট ছাড়া অন্য কোনো দল আন্দোলনে নামেনি। আন্দোলন সফলতার দিকে এগিয়ে যায়। সাফল্য যখন নিশ্চিত তখন অনেকেই আন্দোলনে শরীক হয়। গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ে আত্মাহুতি দেয়।

এরশাদ সরকার কামাল-মুন্নাসহ আরো কয়েকটি তাজা প্রাণ কেড়ে নেয়। বিল রাষ্ট্রপতির কাছে অনুমোদন করতে পাঠান হলেও জনতার প্রতিরোধের মুখে এরশাদ সাহেব অনুমোদ না করেই বিল ফেরত পাঠাতে বাধ্য হন। জনতার জয় সূচিত হয়।

এই উপমহাদেশের বিগত চল্লিশ বছরের ইতিহাসে সংসদ থেকে পাশ করা বিল ফেরত পাঠাতে রাষ্ট্রপতিকে বাধ্য করা কেবলমাত্র বাংলার জনগণই করতে পেরেছে। সংসদের ভিতরে ও রাজপথে আমরা আন্দোলন চালাতে থাকি, কারণ এই সরকারকে অপসারণ করতে না পারলে জনগণের মুক্তি আসতে পারে না।

নির্বাচনের পর পার্লামেন্টের প্রথম অধিবেশনে এরশাদ সামরিক আইন তুলে নিয়েছিলেন এবং দাবি করে যাচ্ছিলেন যে তিনি গণতন্ত্র দিয়েছিলেন কিন্তু এ তন্ত্রকে আর যাই হোক গণতন্ত্র বলা যায় না। আইয়ুব, জিয়া, এরশাদ প্রতিটি সামরিক স্বৈরাচার তাদের নিজেদের মডেলে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বলেছে, বলছে। মূলত দেশের মানুষের ভোটের অধিকার ভাতের অধিকার ও মৌলিক অধিকার ক্যান্টনমেন্টেই বন্দি। সেখানেই ক্ষমতার উৎস ; জনগণ ক্ষমতার উৎস নয়। ক্ষমতার বদল হচ্ছে বুলেট দিয়ে, ব্যালট দিয়ে নয়। এই 'তন্ত্র'কে রিমোট কন্টোল 'মার্শাল ডেমোক্রেসি' (সামরিক গণতন্ত্র) বলা চলে। জনতার অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এরশাদ সরকারের পদত্যাগের দাবিতে এক দফা কর্মসূচি নিয়ে আমরা ঢাকায় অবরোধের ডাক দেই। সমগ্র বাংলাদেশ থেকে হাজার হাজার মানুষ ঢাকায় আসার প্রস্তুতি নেয়, সব দমন নীতি উপেক্ষা করে। ৮ নভেম্বর থেকেই সরকার ঢাকার সঙ্গে সমগ্র বাংলাদেশের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। জনপথ, সড়কপথ বন্ধ করে দেয় যাতে মানুষ ঢাকায় আসতে না পারে। সমস্ত জেলা থেকে ঢাকা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে; তারপরও ঢাকার রাজপথে জনতার ঢল নামে। ১৪৪ ধারাও উপেক্ষা করে মানুষ রাজপথে নামে।

স্বৈরাচারের ভিত কেঁপে ওঠে। কেবলমাত্র ক্যান্টমেন্টেই সরকারের ক্ষমতার উৎস হিসেবে রয়ে যায়। সেখান থেকেই দেশ ও জাতিকে শাসন ও শোষণ করে চলে তারা। একদিন এ অবস্থার অবসান

ঘটবেই। আমরা চাই রাজনীতি অস্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করবে। অস্ত্র দিয়ে রাজনীতি সাময়িকভাবে দাবিয়ে রাখা যায়, তবে তা চিরস্থায়ী হয় না।

আইয়ুব, ইয়াহিয়া, জিয়াউর রহমান চেষ্টা করেছিল পারেনি, এরশাদও পারবে না। জনতার জোয়ারে তখত তাউস ভেঙ্গে খান খান হবে।

কথা ছিল ১০ নভেম্বর সকাল ১০ টায় অবরোধ শুরু হবে। সমগ্র প্রশাসন যন্ত্র অচল করে দিয়ে সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করা হবে। প্রেসক্লাবের সামনে দিয়ে সচিবালয়ের পাশে তোপখানা রোডে এলাম। মুহূর্তে দু'পাশ থেকে জনতার ঢল নামলো, যেন এজন্যেই এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল সবাই। মিছিল নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি। পনেরো দলীয় ও আওয়ামী লীগ দলীয় নেতারা গাড়ির ভেতরে। চারদিকে হাজার হাজার মানুষ। গাড়ির পাশে পাশে আমাদের দলীয় কর্মীরা।

সামনে স্লোগান দিতে দিতে এক তরুণ এগিয়ে যাচ্ছে। লম্বা কদম, দোহারা শরীর, মাথাভরা চুল, কোমল কপোল ছাপিয়ে দুটি শান্ত চোখ এবং বাংলার শ্যামল মাঠের মতো গায়ের রং। রক্তজবার মতো লাল রঙের শার্টটি কোমরে বাঁধা। বুকে-পিঠে সাদা রঙের কালিতে লেখা দু'টি স্লোগান–বুকে 'স্বৈরাচার নিপাত যাক', পিঠে 'গণতন্ত্র মুক্তি পাক'। আমি দারুণভাবে চমকে উঠলাম। ধীর পদক্ষেপে স্লোগান দিতে দিতে এক সময় থেমে আমাকে লেখাগুলি দেখাল সে। শিল্পীর তুলিতে আঁকা লেখা। গাড়ি তখন মুক্তাঙ্গন ছাড়িয়ে জিরো পয়েন্টের দিকে অত্যন্ত ধীর গতিতে এগোচ্ছে। আমি ইশারায় তাকে কাছে ডাকলাম। সে বুঝতে পারলো না। গাড়ির জানালা দিয়ে কর্মীদের অনুরোধ করলাম তাকে কাছে নিয়ে আসতে। জনতার স্রোতে মাঝে মাঝেই সে আমার দৃষ্টির আড়ালে হারিয়ে যাচ্ছিল। আর তখনই কি এক অজানা আশংকায় আমার মন কেঁপে উঠছিল।

কে একজন গিয়ে তাকে কাছে নিয়ে এলো, জানালো ওর নাম নূর হোসেন। মনে পড়ে আমি তাকে বলেছিলাম–'জামাটা গায়ে দাও, একি সর্বনাম করেছো, ওরা যে তোমাকে গুলি করে মারবে।'

নূর হোসেন মাথাটা এগিয়ে দিল আমার কাছে। বলল–'জান দিয়া দিমু আপা, আপনে শুধু মাথায় হাত বুলাইয়া দ্যান।'

আমি ভীষণভাবে তার কথার প্রতিবাদ করলাম–'না, জীবন দেবে ক্যানো, আমি আর শহিদ চাই না, আমি গাজী চাই। ওকথা আর মুখেও আনবে না। জামাটা গায়ে দাও। ওরা তোমাকে গুলি করবে বলে নূর হোসেনের মাথা ভরা ঝাঁকড়া কালো চুলে হাত বুলিয়ে দিলাম। চুলগুলি মুঠো করে ধরে আবার বোনের দাবি নিয়ে অনুরোধ করলাম জামাটা পরতে। আমার হাত ধরে বেশ কিছুক্ষণ নূর হোসেন গাড়ির পাশে পাশে হাঁটলো। তারপর কখন যেন জনতার স্রোতে হারিয়ে গেল।'

জিরো পয়েন্ট অতিক্রম করে গাড়ি এগোতে যাবে, হঠাৎ সেক্রেটরিয়েটের দিকে যেখানে পুলিশ দাঁড়িয়ে তারই খুব কাছাকাছি দেয়ালের দিকে বোমার শব্দ হলো। ধোঁয়া উঠলো। কিছুক্ষণ গাড়ি থামালাম। বুঝতে বাকি রইলো না যে সরকারি কারসাজি। একটু পর প্রমাণও পেয়ে গেলাম। এলোপাতাড়ি গুলি শুরু হলো। জিরো পয়েন্ট ছেড়ে আমরা সামনে গিয়ে থাকলাম। ট্রাকে করে পুলিশ আমাদের পেছনে পেছনে এগোতে শুরু করেছে ও এলোপাতাড়ি গুলি চালাচ্ছে। আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সত্তর বছর বয়স্ক আজাহার সাহেব, যার সাদা চুল-দাড়ি শোভিত চেহারা যে কোনো মানুষের মনে শ্রদ্ধা জাগায়। তাঁকে পুলিশ লাঠি দিয়ে পিটিয়ে রাস্তায় ফেলে দিল। টার্গেট ঠিক করে করে ওরা গুলি চালাতে থাকে। নূর হোসেন, বাবুলসহ বহু কর্মী গুলিবিদ্ধ হয়। ঠিক আমার গাড়ি লক্ষ্য করে ট্রাক থেকে গুলি চালানো হচ্ছিল। আমার গাড়ির কাছেই গুলিতে বহু কর্মী আহত হয়। গাড়ি নিয়ে তবু আমি এগোতে থাকি। এক সময় যখন আমরা গোলাপ শাহ্র মাজারের পাশে রমনা ভবনের মোড়ে আসি, এবার আমার গাড়ি লক্ষ্য করে বোমা ছোঁড়া হয়। বিকট শব্দে ফাটে বোমাটি। ধোঁয়ায় সব কিছু আচ্ছন্ন হয়ে যায়। ধোঁয়া কেটে গেলে দেখি পুলিশের গাড়ি আমাদের ঘিরে ফেলেছে। এরই মধ্যে কয়েকজন আহতকে তুলে নিয়ে অন্য একটি গাড়ি হাসপাতালে চলে যায়।

আমার গাড়ি থামিয়ে একজন পুলিশ কর্মকর্তা আমার ড্রাইভারকে নেমে যেতে বলে। সে নাকি নিজেই গাড়ি চালাবে। এই বলে চাবি কেড়ে নেয়ার জন্যে হাত বাড়ায়। আমি প্রতিবাদ করি। এর মধ্যে

আমাদের নজরে পড়ে গুলিবিদ্ধ নূর হোসেনকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে পনেরো দলের একজন কর্মী। পুলিশের লোকেরা রিকশা থেকে জোর করে নূর হোসেনকে ভ্যানে তুলে নেয়। এদিকে আমার গাড়িও সম্পূর্ণভাবে ঘেরাও করে রেখেছে। আমি পুলিশকে অনুরোধ করলাম ওকে আমার গাড়িতে তুলে দিতে। হাসপাতালে নিয়ে যাবো। কিন্তু আমাকে এক ইঞ্চিও এগোতে দিল না। ওকে নাকি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হবে। ওরা মিথ্যে বলেছিল। নিহত ও আহতদের পুলিশ কন্টোল রুমে নিয়ে অযত্নে ফেলে রেখেছিল। এবং পরে মাটিতে পুঁতে ফেলা হয়।

এদিকে ওয়ারলেসে খবর আসতে থাকে আমাকে গ্রেফতার করার জন্যে। জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। আমার গাড়ি থেকে কয়েকগজ দূরে হাজার হাজার মানুষ ঘিরে রয়েছে। পুলিশও ব্যারিকেড সৃষ্টি করে আছে। জনতার মাঝ থেকে তীব্র প্রতিবাদ ফেটে পড়ছে। একটি ছেলের কথা মনে পড়ছে। লুঙ্গির কাঁচা মেরে সে পুলিশকে রুখে দাঁড়িয়েছে। পুলিশ জনতাকে ধাওয়া করছে কখনো রাইফেল তুলে, কখনো বেয়নেট বাড়িয়ে। কিন্তু তাতেও জনতা দমছে না। তাদের একটি কথা—'আপাকে নিয়ে যেতে পারবে না।' এক পর্যায়ে দেখলাম মতিঝিল থানার একজন পুলিশ কর্মচারী ঢিল ছুড়তে শুরু করেছে। জনতার সঙ্গে পেরে উঠতে না পেরে ইচ্ছেমত গালিগালাজও শুরু করেছে। মেজাজটাই খারাপ হয়ে গেল। নামার জন্য আবার চেষ্টা করলাম, তাও নামতে দিল না, জোর করে গাড়ির দরজা ধরে আটকে রাখলো। গাড়ির ড্রাইভারকে নেমে যেতে বললো, তার কাছে গাড়ির চাবিও চাইলো। এবার সহ্য হলো না। দিলাম ধমক, 'কেন চাবি নেবেন?'

পুলিশ বলল, 'আমি চালাবো।'

'কেন চালাবেন? আমি কেন আপনাকে চালাতে দেব? প্রয়োজন হলে আমি নিজেই চালাব আমার গাড়ি।'

গাড়ির দরজার পাশে দাঁড়ানো পুলিশ অফিসারের ওয়ারলেসে তখনও নির্দেশ আসছে, আমাকে গ্রেফতার করতেই হবে। আমার গাড়ি ঘিরে রাখলেও জনতার স্রোতের জন্য গ্রেফতার করতে পারছিল

না। অদূরে দাঁড়ানো কয়েকজন কর্মীকে ওরা ট্রাকে তুলে নিল ও বেদম পিটাতে লাগলো। সব সহ্যের বাইরে চলে যাচ্ছিল। পুলিশকে বললাম, 'জনতা দেখছেন? সবাইকে ডাক দিলে তখন কি অবস্থা হবে? কত পুলিশ আছে? আর কত মানুষের জীবন নেবেন আজ হিসাব হয়ে যাবে। ভালো চান তো এখনই ওদের ছেড়ে দেন।'

ওরা তখন সচকিত হয়ে আমাকে ঘিরে রাখলো। এদিকে জনতাও অধৈর্য হয়ে ধীরে ধীরে আমার গাড়ির দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করলো। পুলিশ নিজেই ঘেরাও হবার সম্ভাবনা দেখে ব্যারিকেড তুলে নিয়ে পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। সামনে জনতার মিছিল। আবার স্লোগান তুলে আমাদের গাড়ি এগিয়ে নিয়ে চলল।

জিরো পয়েন্ট ছেড়ে প্রেসক্লাব অভিমুখে যাবার পথে শুনলাম আবার পুলিশ গুলি চালিয়েছে। এখানেও জনতার সঙ্গে পুলিশের ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া শুরু হলো। আমি মুখ বাড়িয়ে পেছনে আসা পুলিশের গুলি থামাতে নির্দেশ দিলাম। আমার ড্রাইভার কার নির্দেশে যেন জোরে গাড়ি চালিয়ে প্রেসক্লাবের ভেতর ঢুকে পড়ল। দোতলায় বসে আমরা সাংবাদিক সম্মেলন করলাম। পরপর দুইদিন হরতালের ডাক দেয়া হল। প্রথমদিন দেশব্যাপী সকাল-সন্ধ্যা, তার পরদিন দুপুরের পর শুধু রিকশা চলবে। নূর হোসেন, বাবুলসহ পাঁচজন নিহতের নাম এখানে বলা হল।

প্রেসক্লাব থেকে বেরিয়ে আমরা যখন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কদমফুল ঝর্ণার কাছে পৌঁছেছি, তখনও বুঝিনি আরো কিছু বিস্ময়, সামনে চমকপ্রদ রসিকতা অপেক্ষা করছিল। মুহূর্তেই মনে হলো কোন দেশে বাস করছি আমরা! আমি জাতীয় সংসদের বিরোধীদলের নেতা, আমার গাড়িতে জাতীয় পতাকা। সরকারি প্রশাসন আমাকে ঘেরাও করে, গুলিবর্ষণ করে, এটা কি জাতীয় পতাকার প্রতি অবমাননা নয়! এরশাদ সরকারের নতুন পদ্ধতিটি দেখে হাসি পেল, এটা কোন ধরনের বর্বরতা? সরাসরি ক্রেন দিয়ে এবার আমাকেসহ গাড়িটা উঠিয়ে নিয়ে বন্দি করার কি আধুনিক পদ্ধতি! রাজনীতি করতে এসেছি যখন, তখন জেল গুলি অত্যাচার হবে তা জেনেই এসেছি। ছোটবেলা থেকে বাবাকে তো দেখেছি, সে অভিজ্ঞতা আমাকে রুখবে কেমন

করে? একাত্তরের দীর্ঘ নয় মাস পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতো বন্দি থাকার তিক্ত মুহূর্তগুলো তো আমার এখনও মনে আছে। মৃত্যুও যে কোন সময়ই তখন হতে পারত। আমাকে দুর্বল ভাবার সাহস হয় কি করে ওদের! ১৯৮৩ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ছয়বার বন্দি অবস্থায় নিঃসঙ্গ মুহূর্ত কাটানোর অভিজ্ঞতাও আমার রয়েছে।

দেশ ও জনগণের জন্য কিছু মানুষকে আত্মত্যাগ করতেই হয়, এ শিক্ষাদীক্ষা তো আমার রক্তে প্রবাহিত। ১৫ আগস্ট ১৯৭৫-এর পর প্রবাসে থাকা অবস্থায় আমার জীবনের অনিশ্চয়তা ভরা সময়গুলো আমি তো দেশের কথা ভুলে থাকতে পারিনি? ঘাতকদের ভাষণ, সহযোগিদের কুকীর্তি সবই তো জানা যেত।

অধিকার হারা মানুষের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন বাজি রেখে নেমেছি, জেল বা গৃহবন্দি হওয়া তো কিছুই নয়। কথায় বলে, 'গলায় যদি ফাঁসির ডোর, হাতকড়াতে ভয় কি তোর।' দুঃখও হয় হাসিও পায়–এরা আমার জন্য কত ফন্দি-ফিকিরই না বের করেছে।

প্রথমেই আমাদের গাড়ির সামনে পুলিশের জিপ ও ক্রেন দিয়ে গতিরোধ করল। এরপর থাবা দিয়ে ড্রাইভারের হাত থেকে চাবি কেড়ে নিল। আমি ড্রাইবারকে গাড়ি পেছনে ঘোরাতে বলছিলাম। ড্রাইভার জানাল। 'চাবি নিয়ে গেছে।'

ক্রেন থেকে খুব মোটা মোটা চেন নামিয়ে ওরা আমাকেসহ গাড়ি বাঁধার প্রস্তুতি নিল। সেই মুহূর্তে সকলকে গাড়ি থেকে নামতে বললাম, নিজেও নামলাম। তারপর পায়ে হেঁটে প্রেসক্লাবের ভেতরে ঢুকলাম। কয়েকজন পুলিশ 'ম্যাডাম' 'ম্যাডাম' বলতে বলতে পেছনে এলো, আমার কথা বলার প্রবৃত্তি হলো না। ওরাও আর প্রেসক্লাবের ভেতরে ঢুকল না। সামনের রাস্তায় ঘিরে ছিল; আমার গাড়ির চাবি আটকে রেখেছিল। সাড়ে তিনটা পর্যন্ত প্রেসক্লাবে থাকতে হলো।

তারপর সোজা বঙ্গবন্ধু ভবনে চলে গেলাম। সেখানেও পুলিশ বাড়ি ঘিরে রাখল। সন্ধ্যায় আবার সাংবাদিকদের সঙ্গে বৈঠক হয়। রাজধানীর বিভিন্ন স্থান থেকে নিহত ও আহতের খবর, জনতার মিছিলের খবর আসতে লাগল।

পরদিন ১১ নভেম্বর সন্ধ্যার দিকে আমি বঙ্গবন্ধু ভবন থেকে বের হলাম প্রেসক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনে যাবার জন্য। যেই গেট দিয়ে বের হয়ে রাস্তায় নেমেছি পুলিশ আমায় ঘিরে ধরল ও জিপে উঠাতে চাইল। জিপে কোথায় নেবে তার কি কোনো ঠিক আছে? আমরা আপত্তি জানালাম। মিরপুর রোড পর্যন্ত যাবার পর মহিলা পুলিশ ও অন্যান্য পুলিশরা আমাকে ঘিরে ধরল এবং যেতে বাধা দিল। রাস্তায় তখন হাজার হাজার মানুষের ভিড়, ক্রমশ তারাও বিক্ষুব্ধ হতে থাকল। এখানেও শতাধিক দেশি-বিদেশি সাংবাদিক ছিলেন। তারাও একের পর এক প্রশ্ন করে যাচ্ছেন। একজন বিদেশি সাংবাদিক, সম্ভবত ফরাসি টেলিভিশনের, বারবার প্রশ্ন করছিলেন, 'হোয়াট ইজ দ্যা চার্জ? হোয়াট ইজ দ্যা চার্জ?' পুলিশ আমার গতিরোধের বা গ্রেফতারের সরকারি নির্দেশ দেখাতে পারল না। বেশ কিছুক্ষণ তর্কবিতর্ক হলো। এক সময় তারা জোর খাটাল বঙ্গবন্ধু ভবনে ফেরার জন্য। মহিলা পুলিশরা আমার হাত ধরার চেষ্টা করল, কে একজন ধমক দিল। হেঁটে আমিই তখন ফিরে আসি বঙ্গবন্ধু ভবনে। পুলিশ আর বাড়াবাড়ি করল না। তবে সবাইকে বাড়ি থেকে বের করে দিল। আমার আর কথা বলার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা হচ্ছিল না।

মাত্র কিছুক্ষণ আগে এই বাড়িটি কোলাহলমুখর ছিল। আমারও ব্যস্ততার সীমা ছিল না। আমি যেন এক বিরাট শূন্যতার মধ্যে প্রবেশ করলাম। তবে একাকিত্ব আমাকে স্পর্শ করতে পারেনি। জীবনের বহু মূলবান সময়ে আপনজনদের স্মৃতি আমার সাথী। বসার ঘরে ঢুকে বসে পড়লাম। আমার সামনে শূন্য এই ঘরখানায় প্রতিদিন কত মানুষ ভিড় জমায়। দেখা করেও কুলোতে পারি না। কত মানুষকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতে হয়, পাঁচ-দশ মিনিট পর পর সময় দিলেও কাজের শেষ হয় না। সকলকে খুশি করতে পারি না–কতজনের কথা শেষ হয় না। আর আব্বার প্রমাণ সাইজের ছবি, দুই হাত তুলে তিনি যেন বলছেন "ভায়েরা আমার।" পাশেই মায়ের ছবি, দুই হাত তুলে তিনি যেন কষ্ট সব যন্ত্রণা সহ্য করবার মতো শক্তি যার কাছে থেকে শেখা—আত্মত্যাগের সেই মূর্ত প্রতীক।

খানিক পর আমি বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। দূরে স্লোগানের আওয়াজ ভেসে এল।

আবার গুলির আওয়াজ শোনা গেল। অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না। ওরা কি আবারও কোনো জীবন কেড়ে নিল? আর কত রক্ত চায় এই ঘাতকের দল?

কত তাজা প্রাণ রাজপথে বুকের রক্ত দিয়ে লিখে যাচ্ছে–এই সমাজ বদলে দাও, আমরাও মানুষ, বাঁচার মতো বাঁচতে চাই, ক্ষুধা দারিদ্র থেকে মুক্তি চাই। আমাদের মুক্তির সংগ্রাম চলবেই চলবে।

নূর হোসেনের কথা বার বার মনের কোণে ভেসে উঠছিল। ইতিহাসের পাতায় রক্তের আখরে আর একটি নাম সংযোজিত হলো অনেক নামের সাথে। নূর হোসেন মরেনি। বেঁচে আছে। অমর হয়ে আছে। জীবন দিয়েই নূর হোসেনরা বেঁচে থাকে হাজার মানুষের স্মৃতিতে। বেঁচে আছে প্রতিবাদের ভাষা হয়ে। কেন জীবন দিতে হয় নূর হোসেনদের? কি তাদের অপরাধ?

অপরাধ, ও বাঁচতে চেয়েছিল। সুন্দর জীবন চেয়েছিল। ওর অনেক আকাঙ্ক্ষা ছিল, মেধা ছিল। দরিদ্র বাবা-মা দুবেলা দুমুঠো ভাত দিতেই হিমশিম খেত, ওর মনের চাহিদা মেটাবে কি করে? ওর মেধার বিকাশের সুযোগ দেবে কি করে?

সর্বস্ব হারিয়ে গ্রাম ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছিল পুরোনো ঢাকার গলিতে ছোট্ট একটি কামরায়। কোনোমতে ছেলেমেয়েদের নিয়ে মাথা গোঁজানো। স্কুটার চালিয়ে দিনশেষে ঘরে ফেরে নূর হোসেনের বাবা। সামান্য রোজগার। ছেলেদের লেখাপড়া শেখার দারুণ ঝোঁক। স্থানীয় স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। মনে আশা যদি লেখাপড়া শিখে চাকরি করতে পারে, একটু সচ্ছলতার মুখ দেখতে পারে। পাঁচ-ছয় ক্লাস পর্যন্ত কোনোমতে পড়াশোনা করবার পর আর ওদিকে মন থাকল না নূর হোসেনের। নিয়মিত বেতন দিতে পারে না, শিক্ষকদের গঞ্জনা সহ্য করতে হয়। বইখাতা সময়মত কিনতে পারে না, কেবলই পিছিয়ে যায়। সকালে বাসি ভাতও পায় না, পেটে ক্ষুধার জ্বালা, পড়ায় মনে বসাতে পারে না। কলের পানিতে কতক্ষণ থাকা যায়। ফিরে এসে যে এক মুঠো ভাত জুটবে তারও নিশ্চয়তা থাকে না। কোনোদিন

কপাল ভালো জুটে গেল, কোনোদিন মায়ের শুকনো মুখ। ভাত চাইতে মায়ের চোখের কোণ ভিজে ওঠে, মুখে বলতে হয় না, বুঝে ফেলে। ক্ষুধার জ্বালা নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। হয়তো ডাংগুলি খেলে যন্ত্রণা ভোলার চেষ্টা করে, ক্ষুন্নিবৃত্তির ভিন্ন কোনো পথ ধরলে তাৎক্ষণিক ক্ষুধা থেকে মুক্তি পেলেও বিবেকের যন্ত্রণা দগ্ধ করে। বহু শিশু হয়তো এভাবে বিপথে চলে যেতে বাধ্য হয়।

কখনও মায়ের রুদ্র মূর্তি, ভাত চাইতেই হাতে চেলা কাঠ নিয়ে তেড়ে আসেন, মায়ের এ রুদ্র মূর্তি কিসের প্রকাশ? মা হয়ে সন্তানের মুখে দু'মুঠো ভাত তুলে দিতে পারছে না। এ যে কি বড় কষ্ট, কি যন্ত্রণা, কি ভীষণ আত্মগ্লানি—কিভাবে চেপে রাখবে মা! মায়ের রাগ এ সমাজের উপর, সংসারের উপর, রাষ্ট্রের উপর। সন্তানের উপর নয়।

এই পরিবেশ থেকে বেড়ে উঠেছে নূর হোসেন। চোখে স্বপ্ন ছিল সমাজের পরিবর্তন হবে। মাকে সে বলতো, দিন একদিন আসবে, তোমাদের আর ভাঙ্গা ঘরে থাকতে হবে না, কষ্ট করতে হবে না। সুন্দরভাবে থাকতে পারবে। না খেয়ে কেউ কষ্ট পাবে না, আমরা সেই সমাজ গড়ব। এই স্বপ্ন একা নূর হোসেনের নয়, এ দেশের লক্ষ কোটি নূর হোসেনের।

সেই সমাজ গড়ার স্বপ্ন নিয়েই দুঃখী মানুষের হাসি ফোটাবার অঙ্গীকার নিয়েই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব দীর্ঘ ২৩ বৎসর সংগ্রাম করেছিলেন। পাকিস্তানি শাসক-শোষকের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার লক্ষ্যে স্বাধীনতা যুদ্ধের ডাক দিয়েছিলেন। অনেক রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতার লাল সূর্যকে ছিনিয়ে এনেছিলেন। অনেক বাঙালি জাতি। বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ গড়ার পাশাপাশি সমাজ পরিবর্তনের পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। কিন্তু স্বাধীনতা-বিরোধী পরাজিত শক্তি প্রতিশোধের নেশায় ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছিল, আর ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট ঘাতকের দল ১৯৭১-এর পরাজয়ের প্রতিশোধ নিল জাতির জনককে হত্যা করে। মাত্র ৩ বৎসর ৭ মাস এদেশের মানুষ সত্যিকার গণতন্ত্রের স্বাদ পেয়েছিল। তারপর শুরু হলো ষড়যন্ত্রের রাজনীতি। সেনা ছাউনিতে বসে একের পর জেনারেলরা সামরিক বাহিনীর অফিসার, জোয়ান ও রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের

রক্তের হোলি খেলতে শুরু করল। ক্ষমতা বদলের মাধ্যম হলো বুলেট, অর্থাৎ অস্ত্র। ব্যালট, অর্থাৎ জনতার মৌলিক ভোটাধিকার পদদলিত করা হলো। অন্যায় অবিচার শোষণ দুর্নীতি চরম আকার ধারণ করে চলল। এর প্রতিবাদ করতে গেলেই প্রতি উত্তরে আসে বুলেট, নূর হোসেনের সংখ্যা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে।

কিন্তু "নূর হোসেন তোমার প্রতি সমগ্র জাতির আজ অঙ্গীকার। তুমি প্রতিবাদের প্রতীক। এ অবস্থার পরিবর্তন আমরা ঘটাবই। তুমি আজ প্রতিবাদের পোস্টার হয়ে রয়েছ প্রতিটি মুক্তিকামী বাঙালির হৃদয়ে। তোমাকে হাজার সালাম। আমাদের অঙ্গীকার : "স্বৈরাচার নিপাত যাক, গণতন্ত্র মুক্তি পাক।"

রচনাকাল : ১৭.১.৮৯

ওরা টোকাই কেন

এক বিদেশি সাংবাদিক একবার আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আপনারা মিছিলে বাচ্চাদের ব্যবহার করেন কেন?'

বাচ্চা বলতে ওরা দেখেছে টোকাইদের। বিবিসি বিগত আন্দোলনের সময় একবার তথ্যনির্ভর খবর পরিবেশন করতে পারেনি। সেবার সংবাদ প্রেরণে বেশ ক্রটি লক্ষ্য করা গিয়েছিল। আমাদের টোকাইরাও যথেষ্ট সচেতন। তারা পথে-ঘাটে থাকে, হরতাল ও আন্দোলনের সময়কার ঘটনাবলির সঠিক তথ্যও তাদের বেশ মনে থাকে। সন্ধ্যায় কোনো দোকানে বা রেষ্টুরেন্টের সামনে দাঁড়িয়ে তারাও বিবিসি শোনে। খবর পরিবেশনে একটু এদিক-সেদিক হলেই তাদের ছোট মনটা দারুণভাবে ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ হয়। প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে বিদেশি সাংবাদিক বা পর্যটক দেখলেই তাদের প্রশ্ন করে, 'আপনি মার্ক টালী? ক্যামেরা আছে? সাংবাদিক?'

আপনাকে যিনি প্রশ্ন করেছিলেন সে বেচারা সাংবাদিকও তাদের হাতে পড়ে নাজেহাল হতে হতে বেঁচে যান। সেবার টোকাইদের এ ঘটনা বহু সংবাদপত্রে প্রকাশ পেয়েছিল। বোধ হয় সেজন্যই তিনি প্রশ্নটি করেছিলেন, মিছিলে বাচ্চাদের কেন ব্যবহার করি।

আমি তাঁকে আমার যে উত্তর জানা ছিল ব্যাখ্যা করে বোঝাবার চেষ্টা করি। কিন্তু প্রশ্নটা আমার মনেও থেকে যায়। বার বার ঘুরেফিরে আসে। কেন এই শিশুরা রাস্তায়? এদের নাম কেন হলো টোকাই? এদের জন্ম, বেঁচে থাকা, ভবিষ্যৎ সব কিছু আমার মনে আলোড়ন সৃষ্টি করে। এই শিশুরা কোথা থেকে এলো? কেনই বা এরা রাস্তাঘাটে পড়ে থাকে? স্বাধীনতার ১৭ বছর পরেও এদের অবস্থার পরিবর্তন

হয়নি কেন? বরং দিনের পর দিন সংখ্যায় বৃদ্ধি পাচ্ছে। অবস্থার অবনতি ঘটছে। এর জন্য কে বা কারা দায়ী? কেন?

রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে যারা যুক্ত—সরকারি আমলা, ব্যবসায়ী, শিক্ষক, চিকিৎসক, রাজনীবিদ, সমাজসেবক, বুদ্ধিজীবী, সমাজের যে যেখানে অবস্থান করছেন, যখনই সুযোগ পাচ্ছেন তখনই বলছেন, "শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ" কিন্তু এই শিশুরা, যাদের জন্ম বেঁচে থাকা, বড় হওয়া সবই ফুটপাতে, ডাস্টাবিনের ধারে, তাদের ভবিষ্যৎ কি?

টোকাই! ওরা মিছিলে যায়, প্রতিবাদ জানায়–কিন্তু কিসের মিছিল, কেন প্রতিবাদ, তারা কি কিছু বোঝে? না, বোঝে না। ওরা যেভাবে বেঁচে আছে সেভাবেই নিজেদের ভাগ্যকে মানিয়ে নিয়েছে। তবু ওদের বুকের ভেতর, মনের অগোচরে আছে এক প্রতিবাদের ঝড়। সে ঝড়কে সঠিকভাবে না জানলেও ওরা এটুকু জানে কোথাও একটা অন্যায় রয়েছে, যার প্রতিবাদ করতে হবে। মিছিলে যোগ দিতে হবে। প্রতিবাদের মিছিল পেলেই ওরা শরিক হয়।

ভাষা নেই, শিক্ষা নেই, অবুঝ মন। কোনো গাড়িতে দামী কাপড় পরা ঝকঝকে তকতকে সমবয়সী শিশুমুখ কি ওদের মনে কোনো প্রশ্ন জাগায় না? গাড়ির ধুলো ঝেড়ে একটি বা দুট টাকার জন্য তা শীর্ণ হাত হয়তো বাড়িয়েছে— সে হাত খালি আসবে না ভরে আসবে তা সে জানে না। মলিন মুখ নিয়ে কাচুমাচু হয়ে দাঁড়িয়ে ভিক্ষা চাওয়াই ওদের রীতি, ওরা এটুকুই জানে। তবু ঐ ক্ষুদ্র অবচেতন মনে কখনও কি একবারও প্রশ্ন জাগে না–এই কী জীবন? একেই কি বলে বেঁচে থাকা? কোনো অবস্থাপন্ন ঘরে যদি জন্ম হতো তবে ঐ গাড়িতে ওরা কেউ থাকত আর গাড়ির কাঁচের ফাঁকের শিশুমুখটি রাস্তায় থাকত, যদি এমন হত?

বিদেশি সাংবাদিকের মনে প্রশ্ন— ওরা রাস্তায় কেন? আমার মনেও একই প্রশ্ন— ওরা রাস্তায় কেন? এর উত্তর খুঁজতে গেলে সমাজের বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করবার প্রয়োজন রয়েছে।

প্রথমে যদি আমরা দৃষ্টি ফেলি আমাদের সামাজিক অবস্থার দিকে, তাহলে দেখতে পাবো গ্রামবাংলার আনাচে-কানাচে হাজার হাজার

নারী-পুরুষ-শিশু এমন এক সামাজিক পরিবেশে বাস করছে যে সমাজ দীর্ঘদিনের ঔপনিবেশিক শাসন, আধা-ঔপনিবেশিক ও সামন্ত শাসনের বন্ধনে আবদ্ধ। এই সমাজ ব্যবস্থার অত্যাচার, নির্যাতন ও শোষণের শিকার গ্রামবাংলার নিম্নবর্ণের মানুষরা। এই সমাজের সর্বত্র রয়েছে শাসক ও শোষকের অন্যায়-অবিচারের ছাপ। এখানে কোনো বিচার নেই, নীতি নেই, আচার নেই— 'জোর যার মুল্লুক তার।' প্রতিবাদের কণ্ঠকে সব সময় অংকুরেই বিনষ্ট করবার প্রচেষ্টা ছিল। আবহমানকাল ধরে। তাই তেমন কোনো প্রতিবাদ দানা বেঁধে উঠলেও সমাজের আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়নি। কায়েমি স্বার্থবাদীদের হাতে বার বার মার খেয়েছে এইসব মানুষ।

এ সমাজে সবচেয়ে বেশি অবহেলিত ও নির্যাতিত মেয়ারা। ধর্মীয় কুসংস্কার, অশিক্ষা এদের ওপর অবিচার-অনাচার বাড়িয়েছে, অর্থনৈতিক অবরোধ আরো অসহায় করে তুলে ধীরে ধীরে ধ্বংসের পথে নিয়ে গেছে। এদের সামাজিক নিরাপত্তার কোনো ব্যবস্থা নেই। একটি পরিবারের একমাত্র অবলম্বন সে পরিবারের পুরুষ সদস্য। বৃদ্ধ বাবা, মা, স্ত্রীপুত্র, কন্যা ও ভাইবোন সবার ভরণ-পোষণ দায়দায়িত্ব অর্থ উপার্জনের একমাত্র সম্বল পুরুষটি। সংসারের বাকি কাজের দায় স্ত্রীর। আমাদের দেশে বিশেষ করে গ্রামের পুরুষ ও নারীর তিরিশ থেকে চল্লিশ বছর বয়সে স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যায়। বেশিরভাগ পুরুষ টিবি রোগে আক্রান্ত হয় অথবা গ্যাষ্ট্রিক বা আমাশয়ে ভুগে অকালে মারা যায়। তার পরিবারটিও ভেসে যায়। গ্রামে ভূমি-বসতহীন ছিন্নমূল পরিবারের জন্য কাজের বেশি সুযোগ-সুবিধা থাকে না। ফলে বিধবা স্ত্রী-সন্তানসহ শহরমুখী হতে বাধ্য হয়।

বিয়ের ব্যাপারেও সমস্যা রয়েছে। মুসলিম পরিবারে বিবাহ বা তালাক দেয়ার যে নিয়ম গ্রামে প্রচলিত তাও ত্রুটিপূর্ণ। রাগের মাথায় স্ত্রীকে তিন তালাক বলার সঙ্গে সঙ্গে তালাক হয়ে যাবার নিয়ম রয়েছে। এক্ষেত্রে তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীরা মা হয়ে সন্তানদের ফেলে যেতে পারে না। শহরে গিয়ে বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম করে, কিন্তু এই সমাজ তাদের বাঁচার পথ দেখায় না, দায়-দায়িত্ব নেয় না; বরং পতিতালয়ে স্থান করে নিতে বাধ্য করে। আর 'স্বর্গের দূত' নামে

অভিহিত নিষ্পাপ শিশুরা স্থান পায় রাস্তায়। তাদের পরিচয় হয় 'টোকাই'।

অনেক ক্ষেত্রে একই পুরুষকে একাধিক বিয়ে করতে দেখা যায়। ধর্মে আছে চার বিয়ে করা যাবে। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতামাতা খোঁজ-খবর নেবার প্রয়োজনও মনে করে না। হাতে একজোড়া ইলিশ মাছ ও এক ডজন কাঁচের চুড়িই বিয়ের জন্য অনেক মুল্যবান সামগ্রী। এ গ্রামে এক বিয়ে তো সে গ্রামে এক বিয়ে। এভাবে চারের অধিক বিয়েও করে যাচ্ছে। বিয়ের পর স্বামীর ঘরেও অনেককে নেয়া হয় না। বিবাহিতা বা তালাকপ্রাপ্ত নারী বাবা বা ভাইদের সংসারে সব স্থান পায় না। তখন বাধ্য হয়ে ভাগ্যান্বেষণে সন্তানের হাত ধরে বের হতে হয়। অভাবের সংসারে কে কার দায়িত্ব নেবে? গৃহপরিচারিকার কাজ করলেও নিস্তার নেই। গৃহকর্তার চোখে পড়লে লাঞ্ছিত অপমানিত হতে হয়। মেয়ে হয়ে জন্ম নেয়াটাই কি অভিশাপ? তার প্রতি কেন মর্যাদা ও মমত্ববোধ থাকবে না?

আমার প্রত্যক্ষভাবে জানা একটি ঘটনার কথা বলি। আমাদের গ্রামের বাড়ি টুঙ্গীপাড়ায় জুলেখা নামের একটি মেয়ে আছে। আমাদের পাকের ঘরের পেছনের একটি ঘরে তার মায়ের সঙ্গে থাকত। ছোটবেলা থেকেই ওকে আমরা জানি। ওর মা আমাদের বাড়িতে থালাবাসন ধোয়া ও পানি তোলার কাজ করত। জুলেখাও মা-বোনের সঙ্গে কাজ করত। মাঝে মাঝে সাত-আট মাসের ভরাপেট নিয়ে বৃষ্টি-কাদার মধ্যেও কলসী কাঁখে পানি বয়ে আনত। গ্রামীণ সমাজে এটা অপরাধ বা দৃষ্টিকটু নয়।

সেবার সকলে মিলে গ্রামের বাড়িতে যাই। দেখি জুলেখা আমাদের বাড়িতে কাজ করছে। জানতাম ওর বিয়ে হয়ে গেছে ভিন গাঁয়ে। কিন্তু এখানে কেন? তার উপর সাত-আট মাসের বাচ্চা পেটে আর সেই অবস্থায় ছোটাছুটি করে কাজ করছে। ব্যাপারটা আব্বারও নজরে পড়ে, 'এ শরীরে ওকে দিয়ে কাজ করান হচ্ছে কেন?'

ওর প্রকৃত অবস্থাটা আব্বাকে জানালাম। মাস দুই আগে ওর স্বামী ওকে তালাক দিয়েছে। আব্বা বললেন এ অবস্থায় তো তালাক হয় না! গ্রামের অশিক্ষিত সরল সাধারণ মেয়ে এসবের কিছুই জানে

না। কতইবা বয়স, আঠারো-উনিশ হবে। একটি মেয়ে আছে, মাঝখানে আরও একটি সন্তান মারা গেছে। যতবার সে সন্তানসম্ভবা হয়, স্বামী ওকে ফেলে রেখে চলে যায়। খেতে পায় না, এখানেই আশ্রয় নেয়। ওর স্বামী-শাশুড়িকে খবর দেয়া হলো, ওরা এল না। পরে পুলিশ পাঠিয়ে ধরে আনা হলো। ওর স্বামী ওর কাছে মাফ চাইল এবং ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে গেল। প্রায় পনেরো-ষোলো বছর আগের ঘটনা। সুখের কথা, এখন ওর স্বামী ঠিক আছে। ঐ ঘটনার পর আর তালাক দেয়নি, অন্য বিয়েও করেনি। যদি আমাদের আশ্রিত না হতো তাহলে ঐ মেয়েটিকেও হয়তো বেঁচে থাকার তাগিদে সন্তানের হাত দরে শহরমুখী হতে হতো। শহরে এসে অন্ন-বস্ত্র-আশ্রয় না পেলে অমানুষের হাতে পড়ে হয়ত পতিতালয়েই আশ্রয় নিতে হতো। তারপর সেখানকার অত্যাচার-নির্যাতনের শিকার হয়ে রোগগ্রস্ত হয়ে অকাল-মৃত্যু বরণ করত। আর ওর সন্তানরাই হতো টোকাই।

সামাজিক নিরাপত্তার অভাব থাকায় নানাভাবে আরও পরিবার নির্যাতিত হয়ে শহরমুখী হয়। সাংসারিক প্রয়োজনে মহাজনের কাছ থকে বা গ্রামের সুদখোর অবস্থাপন্নদের কাছে জমিজমা, বসতবাড়ি, ঘটিবাটি বন্ধক রেখে টাকা নেয়। অশিক্ষিত কৃষক টিপসই দিয়ে সামান্য টাকার বিনিময়ে জমি বন্ধক রেখে সর্বস্বান্ত হয়। খরা বন্যা নদীভাঙনে ঘরবাড়ি জমিজমা সব নিঃশেষ হয়েও অনেক পরিবার শহরবাসী হয়ে একই অবস্থার শিকার হয়। সরকারি সাহায্য-সহযোগিতা এরা পায় না। উপরন্তু করের বোঝা, অনাদায়ী ঋণ, সুদ খাজনা আদায়ের নামে ক্রোকি পরোয়ানা ও সরকারি অত্যাচারে বহু পরিবার ছিন্নমূল হয়ে শহরবাসী হতে বাধ্য হয়, ধ্বংস হয়ে যায়। এর মধ্যে যারা সংগ্রাম করে বাঁচতে পারে অর্থাৎ জীবিকার ব্যবস্থা করতে পারে তাদের সংখ্যা নগণ্য।

এভাবে চলছে সমাজের সর্বস্তরে চরম অনিয়ম, অরাজকতা। দুর্বলের উপর সবলের আঘাত, নিম্নস্তরের উপর উচ্চস্তরের কষাঘাত, শোষিতের উপর শাসক ও শোষকের সীমাহীন পীড়ন এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিতদের আধিপত্য অনেক পরিবারকে ধ্বংস করে দেয়। তাদের সন্তানদের টোকাই বানিয়ে রাস্তাঘাটে ছেড়ে

দেয়। এভাবে বিদ্যমান নানা আর্থ-সামাজিক অবস্থার কারণে আমাদের দেশের শিশুরা টোকাই-তে পরিণত হয়।

এই রাজধানী ঢাকা শহরে পাঁচ লাখেরও বেশি টোকাই আছে। ফুটপাত, রেল স্টেশন, লঞ্চঘাট, বাস টারর্মিনাল, বস্তি এদের আশ্রয়স্থল। কোনো গভীর রাতে যদি কেউ শহরে বের হন তবে দেখবেন এরা কিভাবে ঘুমায়, কিভাবে আশ্রয় খোঁজে অন্ধকার নির্জনতায়। ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো, চট বা খবরের কাগজ যোগাড় করে কোনোমতে তার ওপর শুয়ে শীত-গ্রীষ্ম বারো মাস কাটিয়ে দেয়। শীতের রাতে আবর্জনার ভেতর থেকে কাগজ সংগ্রহ করে আগুন জ্বেলে শরীর গরম করে। কনকনে ঠান্ডা বাসাতে একে অপরকে জড়িয়ে, কখনও কুকুর-বেড়ালের পাশে শুয়ে রাত কাটিয়ে দেয় মানব সন্তান–স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ জীব। অনাহার আর অপুষ্টি অকালে এদের জীবনদীপ নিভিয়ে দেয়। দশ-পনেরো বছরের বেশি এরা পৃথিবী দেখতে পায় না। নগণ্য অসংখ্য যৌবনের মুখ দেখতে পেলেও পঁচিশ-তিরিশ বছরের বেশি বাঁচে না। ধুঁকে ধুঁকে জীবন কাটাতে হয় বলে এদের শরীরের ভেতরটা ক্ষয়ে ক্ষয়ে যায়। অকালবার্ধক্য ও মৃত্যু অগোচরে গ্রাস করে এদের জীবন। এদের নাম-ঠিকানা নেই। বাবা-মায়ের পরিচয় নেই। ক্ষুন্নিবৃত্তিই বড় কথা। জীবন প্রদীপ প্রজ্বলিত রাখার তাগিদে প্রতিনিয়ত এরা যুদ্ধরত। জীবনের কোনো অর্থ নেই। এদের প্রতি মমতা ও সহানুভূতিতে ফুটপাতের দোকানদার অথবা কোনো পথিক কখনওবা ছুঁড়ে দেয় এক টুকরো কাপড় লজ্জা নিবারণের জন্য। হোটেলের উচ্ছিষ্ট খাদ্য, বিয়েবাড়ি বা পিকনিক পার্টির উচ্ছিষ্ট, ডাস্টবিনে ফেলা পচা-বাসি খাবারই এদের পেটের জ্বালা মেটায়। কারুর বাড়ির ছেঁড়া লুঙ্গি বা প্যান্ট ভাগ্যে থাকলে জুটে যায়। পেট ফোলা, রুগ্ন হাড্ডিসার শরীরের এইসব শিশুরা অসুখে কোনো চিকিৎসা পায় না। গ্রীষ্ম বর্ষা শীত সবই এদের অর্ধনগ্ন ছোট্ট শরীরের ওপর দিয়ে বয়ে যায়। এদের জন্ম যেমন জানান দিয়ে আসে না, মৃত্যুর খবরও কেউ রাখে না।

আবার জুলেখার কথায় ফিরে যাই। একটি মেয়ের জীবন ও পরিবারকে মডেল হিসেবে ধরলে গ্রামবাংলার হাজার হাজার

পরিবারের চিত্র আমরা দেখতে পাব। গত কয়েক বছর গ্রামবাংলার আনাচে-কানাচে অনেক ঘুরেছি। সর্বত্রই দেখেছি জুলেখাদের একই চেহারা, একইভাবে নির্যাতিত। এ পর্যন্ত জুলেখা দশ থেকে বারোটি সন্তানের মা হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় মাত্র পাঁচটি সন্তান জীবিত, বাকি সবারই অকালমৃত্যু ঘটেছে। যখনই গ্রামের বাড়িতে যাই রান্নাঘরের পাশে ছোট্ট ঘরটায় শিশুর কান্না শুনলেই বোঝার বাকি থাকে না যে জুলেখা আবার মা হয়েছে। আমরা দেশে যারা থাকি টুকটাক কাজ করে দেয়। ওর বয়স এখন খুব বেশি হলে একত্রিশ বা বত্রিশ বছর। এর মধ্যে স্বাস্থ্য ভেঙ্গে গেছে। বছরের পর বছর সন্তান জন্ম দেবার ধকল শরীর সইতে পারেনি। তার ওপর অভাব-অনটন-অপুষ্টিতে শরীরের অবস্থা বর্ণনাতীত।

পরিবার পরিকল্পনার প্রচার টেলিভিশন-রেডিওতে সীমাবদ্ধ থাকায় জুলেখার মতো মেয়েরা এর প্রয়োজনীয়তা জানে না, বোঝে না। যে শ্রেণি টেলিভিশন-রেডিও কিনতে, দেখতে এবং শুনতে পারে তারা সমাজের অংশ। তাদের কাছে প্রচারের কি প্রয়োজন আমার বোধগম্য নয়। বরং গ্রামে গ্রামে গিয়ে প্রচারণা চালালে অনেক কাজে লাগত।

এই পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে জুলেখার অভিমত তুলে ধরছি। যতবার গ্রামে গিয়েছি অথবা ওকে আমাদের শহরের বাড়িতে নিয়ে এসেছি বোঝাবার চেষ্টা করেছি পরিবার পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা। ওর উত্তর পরিষ্কার 'মছলায় কয়না আল্লায় ব্যাজার হইবে' 'আল্লায় মুক দেছে আল্লায় খাওয়াইবে' ইত্যাদি ইত্যাদি।

মছলায় কয় না, অর্থাৎ মৌলভি সাবরা যখন ওয়াজ-নসিহত করেন তখন এর বিরুদ্ধে প্রচার হয়। তাঁদের মতে এটা ধর্মবিরোধী, খোদার উপর খোদগারী, ইত্যাদি।

জন্মনিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে মত পোষণের আরও একটা কারণ হলো সামাজিক নিরাপত্তার অভাববোধ, সন্তান বেশি হলে হাতের কাজে সাহায্য পাওয়া যাবে। বিশেষ করে ছেলে হলে বৃদ্ধ বয়সে এক ছেলে যদি না দেখে তো অন্য ছেলে দেখবে। যতদিন 'রতে (শ্রম দেয়ার শক্তি) বল আছে ততদিন খাইটা খাব, যহন রত পইড়া যাবে তখন কে দ্যাখবে?' অর্থাৎ কিনা বৃদ্ধকালে অচল হয়ে গেলে কে সাহায্য করবে?

কথাগুলির মধ্যে যুক্তি অবশ্যই আছে। সমাজ অথবা রাষ্ট্র যদি নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে পারে তাহলে এই পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণের সার্থকতা কোথায়? এধরনের বহু যুক্তি গ্রামের মানুষের কাছে শোনা যাবে যা তাদের অবস্থা বিচার করলে অযৌক্তিক মনে হবে না।

শিক্ষিত সমাজ বা ধনবানদের মধ্যেও আমরা ব্যতিক্রম দেখি। কন্যা সন্তান অনেক সময়ই অসন্তোষের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আমার পরিচিত একজন শিক্ষিত রাজনৈতিক সচেতন ভদ্রলোক একটি পুত্রসন্তানের আকাঙ্ক্ষায় একে একে আটটি কন্যাসন্তানের জন্ম দিয়েছেন। এমন ঘটনা শহর ও গ্রামে দেদার ঘটে। এর পেছনে মনোবিজ্ঞানের যে দিকটি কাজ করে অন্তত আমার দৃষ্টিতে সেটিও সামাজিক নিরাপত্তাবোধের অভাব। কন্যাসন্তান পরের সম্পত্তি, বিয়ে হলেই পর হয়ে যাবে। বাবা-মাকে তো দেখতে পারবে না। পুরুষশাসিত সমাজে আবার সম্পত্তির উত্তরাধিকার আইন রয়েছে–ছেলে না হলে সম্পত্তি ভোগ করবে কে? পুত্রসন্তান থাকলে সব সম্পত্তির উত্তরাধিকার পুত্র হবে। কিন্তু শুধু মাত্র কন্যাসন্তান হলে সে অধিকার থাকবে না। হয় মাতৃকুলে, না হয় পিতৃকুলে চলে যাবে। স্বামী যে বাড়িটা তৈরি করেছেন স্ত্রীর গহনা বেচে, সংসারের খরচ বাঁচিয়ে, নিরলস পরিশ্রম করে সঞ্চিত অর্থ থেকে অতিকষ্টে, নানা কৃচ্ছ্রতার মধ্য দিয়ে —স্বামীর মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারের প্রশ্ন চলে আসবে। ঐ সম্পত্তিতে স্ত্রীর অধিকার থাকবে মাত্র দুই আনা। স্বামীর আত্মীয়স্বজন ইচ্ছে করলে দুই আনার দাম হাতে তুলে দিয়ে তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতে পারবে। এদেশে এ ঘটনা বিরল নয়। নিজকষ্টের তৈরি সম্পদ ভোগ করবার সুযোগ সকলের হয় না। সম্পত্তি আইনের কারণে বংশরক্ষার তাগিদে একের পর এক সন্তানের জন্ম দিয়ে থাকে। শিশুমৃত্যুর হারও এ কারণেই ব্যাপক ও ভীতিকর। সমাজের বিভিন্ন স্তরে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রতিবন্ধকতা আমরা দেখতে পাই। এর ব্যাপক প্রভাব নিম্নস্তরের মাঝেই বেশি। রাষ্ট্র ও সমাজের কাছ থেকে নিরাপত্তা না পাওয়ার কারণেই এ অনিয়ম চলে আসছে। বেহিসেবী শিশুর জন্মের ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ভয়াবহতা দেশ ও জাতির বিরাট সংকট ডেকে আনছে।

অথচ সরকার এ ব্যাপারে একেবারে উদাসীন, নির্লিপ্ত। কিছুদিন আগে দেশে ইউনিয়ন কাউন্সিল নির্বাচন হয়ে গেল। সাধারণ নিয়ম হল ইউনিয়ন কাউন্সিল নির্বাচনের পূর্বে দেশে আদমশুমারী অনুষ্ঠিত হয়। নতুন ভোটার তালিকা তৈরির পরই স্থানীয় নির্বাচন হবে। কিন্তু ১৯৮৮ সালের এই নির্বাচনের পূর্বে কোনো আদমশুমারী বা নতুন ভোটার তালিকা তৈরি হয়নি। হলে জানা যেত জনসংখা বৃদ্ধি পেয়েছে নাকি পায়নি। আমরা সব সময় দেখে আসছি সব ঘটনার পেছনে একটা কারণ থাকে। যেখানে কেবল অনিয়মের পালা সেখানে নিয়ম রক্ষা করবার চিন্তা করাই অপরাধ। এদেশের রাষ্ট্রপতি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য পুরস্কার পেয়েছেন, অথচ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে আমাদের দেশে গত দশ বছরের সরকারি বা বেসরকারি কোনো সঠিক তথ্য কোথাও পাওয়া যায় না। যা আছে তা অনুমাননির্ভর। আর তাই টোকাইদের সংখ্যা বাড়ছে, শহরমুখী মানুষের সংখ্যাও বাড়ছে সমান হারে।

ভাসমান মানুষের শিশুরাই টোকাই নামে পরিচিত পেয়েছে। এই শিশুদের কি রাস্তায় থাকার কথা? এরা মানবশিশু। স্রষ্টার সর্বশ্রেষ্ঠ জীব আশরাফুল মাখলুকাত হচ্ছে মানব জাতি— যারা জীবনকে গড়েছে স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য, উপভোগ করবার জন্য। বিজ্ঞানের মাধ্যেমে এরা এগিয়ে যাচ্ছে। নতুন নতুন প্রযুক্তি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আরাম-আয়েসের দ্বার খুলে দিচ্ছে। মানব সমাজকে বাঁচার জন্য প্রতিনিয়ত আবিষ্কার হচ্ছে আধুনিক চিকিৎসার নবতর উপকরণ সামগ্রী। উন্নত চিকিৎসার গুণে মানুষ সুস্থ সবল থাকছে, বেঁচে থাকার সময়সীমাও বাড়াতে সক্ষম হচ্ছে।

আবার পাশাপাশি কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে আবিষ্কার হচ্ছে যুদ্ধাস্ত্র মারণাস্ত্র মানুষের জীবন কেড়ে নেবার জন্য, সভ্যতাকে ধ্বংস করে দেবার জন্য। এই অস্ত্র বিক্রির জন্য চাই যুদ্ধ। তাই অনুন্নত দেশগুলিতে কোটি কোটি ডলার খরচ করে এজেন্ট নিয়োগ করা হয় অস্ত্র ব্যবহাররের ক্ষেত্রে প্রস্তুত করবার জন্য। কোথাও দেশে দেশে যুদ্ধ, ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ, গৃহযুদ্দ বাধিয়ে রেখে তারা মুনাফা লুটছে।

আমরা দেখেছি, নানাভাবে এইসব অস্ত্র ব্যবহারের কৌশল গ্রহণ করা হয়, ষড়যন্ত্র পাকান হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকার অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশগুলিকে উপযুক্ত সংঘাতের ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিয়ে দু-পয়সা কামিয়ে নিচ্ছে অস্ত্র ব্যবসায়ী কালোবাজারিরা। একদিকে সভ্যতার বিকাশ অপরদিকে ধ্বংসের উপকরণ তৈরির জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার পাশাপাশি চলছে। এ যেন এক প্রহসন। উন্নত বিশ্বের এই প্রহসনের খেলার শিকার হচ্ছে দরিদ্র দেশগুলি।

একদিকে আণবিক অস্ত্র তৈরির বিভীষিকা, অপরদিকে ক্ষুধার্ত শিশুর ক্রন্দন। অপুষ্টি-অনাহারে লক্ষ লক্ষ শিশু পঙ্গু হচ্ছে, অন্ধ হচ্ছে, অকালে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে, মানবিকতার সুললিত বাণী চেতনার দ্বারে কোনো আঘাত হানছে না। ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে সভ্যতা। যুদ্ধাস্ত্র মারণাস্ত্র তৈরিতে যে অর্থ ব্যয় হয় তা দিয়ে অনুন্নত দেশের কোটি কোটি শিশুকে বাঁচানো সম্ভব। পৃথিবী থেকে 'দরিদ্র' শব্দটা যদি মুছে ফেলা যেত। মানুষ ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাতে পারত। জানি না সেই দিন এ পৃথিবীতে আসবে কিনা। একদিকে বিজ্ঞান ও সভ্যতার বিকাশ, অপরদিকে বর্বরতা ও অসভ্যতার চরম প্রকাশ—বিজ্ঞান ও সভ্যতার অগ্রগতির প্রতি এ এক দারুণ উপহাস হয়ে বিরাজ করছে মানুষের এ পৃথিবীতে।

রাস্তার টোকাইদের ভেতর কত মেধা কত প্রতিভা লুকিয়ে রয়েছে কখনো কি আমরা জানার চেষ্টা করেছি? বায়তুল মোকাররমের সামনে বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে একবার এক জনসভা হচ্ছিল। ক্ষমতাসীন দলের বিভিন্ন বাহিনী সভা পণ্ড করবার চেষ্টা চালায়। তাদের সহযোগিতা করছিল পুলিশ বাহিনীর টিয়ার গ্যাস ও লাঠিচার্জ। আইন সভা-সমাবেশ বন্ধ করতে পারে না বলে মাঝে মাঝেই এই হীন পন্থা স্বৈর সরকার গ্রহণ করে থাকে। এর প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করেছে রাজনৈতিক কর্মী ও জনতা। বিশাল জনসভা হয়েছে। জনতার প্রতিরোধের মুখে সভা বানচালের সব ষড়যন্ত্র ভেসে গেছে। সভাশেষে মঞ্চ থেকে নেমেছি মাত্র, ন-দশ বছরের শিশু নাম মান্নান আহত রক্তাক্ত অবস্থায় কাঁদতে কাঁদতে সামনে এসে দাঁড়াল। পুলিশ তাকে

মেরে হাত-পা ফাটিয়ে দিয়েছে। গাড়িতে তুলে ক্লিনিকে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে বাড়িতে নিয়ে এলাম। সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু ভবনে রেখে দিলাম। ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠল মান্নান। নিয়মিত খাবার ও যত্ন পেয়ে শরীর ভালো হলো। পরিচ্ছন্ন পোশাক-পরিচ্ছদে ওকে খুব মানিয়েছিল। ও আর ফিরে যেতে চাইল না। কোথায়ই বা যাবে? সেই তো পথঘাটে পড়ে থাকতে হবে, হয়তো আবারও একদিন মার খাবে। রেখে দিলাম ওকে। একাকিত্ব ঘোচানোর জন্য আরও একটি ছেলেকে আনলাম। কিন্তু তার সঙ্গে কিছুতেই বনল না। রাস্তায় ফুটপাতে বড় হয়েছে বলে ভব্য আচরণ একেবারে জানে না। সারাদিন মারপিট, খারাপ গালিগালাজ, সমবয়সীদের সঙ্গে কাড়াকাড়ি করে খেয়ে বাঁচতে শিখেছে। তাই অপরের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে সে শেখেনি।

মান্নানের সঙ্গে বনল না বলে ছেলেটি একদিন চলে গেল। তবে আর একটি ছেলে বশির এসে গেল। বশিরের বাবা এক প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। দারিদ্র্যের কষাঘাতে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিলেন তিনি। সেই থেকে বশির ঘরে ছেড়েছে জীবিকার সন্ধানে। রাজমিস্ত্রির সঙ্গে যোগালির কাজ করে। দেখতেও সুন্দর চটপটে বুদ্ধিদীপ্ত, মান্নানের চেয়ে একটু বড় হবে। আচার-ব্যবহারেও খুব ভদ্র, শান্ত। ওকেও রেখে দিলাম বঙ্গবন্ধু ভবনে।

শত কাজের ঝামেলায় মান্নানের খোঁজখবর নিয়মিত নিতে পারতাম না। কাজের লোকজন ওকে খুবই বিরক্ত করত। আমার অগোচরে মারপিট বকাবকি করত, শাস্তিও দিত। এসব হঠাৎ একদিন জানার পর বকুনি তো বটেই, দু'একজনকে ছাঁটাইও করি। মান্নান মার খেত, অত্যাচার সহ্য করত, কিন্তু কখনও নালিশ জানাত না। দরিদ্র হয়ে জন্মেছে বলে এরা শুধু বঞ্চিত হতে শিখেছে, অত্যাচারিত হতে শিখেছে কিন্তু এর প্রতিবাদ করতে শেখেনি। প্রতিকার কিভাবে পাবে তা জানে না। নালিশ করবার, প্রতিকার পাবার যে জায়গা থাকে তাও জানে না।

মান্নান ও বশিরকে স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছি। মান্নান প্রথম শ্রেণিতে বশির পঞ্চম শ্রেণিতে। প্রথমবার পরীক্ষা দিয়ে মান্নান পেল

অংকে ১০০, ইংরেজিতে ৯৫, বাংলায় ৫৬। বশির সব বিষয়ে ফেল। বয়স বেশি বলে ওকে নিচু ক্লাসে দেয়া হয়নি। মান্নানেরও বয়স বেশি, তবুও মানিয়ে গেছে। স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাছে আমি কৃতজ্ঞ যে তিনি ওদের ভর্তি করেছেন। মান্নান একটি উদাহরণ। বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে কত মেধা লুকিয়ে আছে, কত শিশু সামান্য পরিচর্যার অভাবে বিকাশের সুযোগ পাচ্ছে না। কত সম্ভাবনাময় জীবন অকালে ঝরে যাচ্ছে। আমরা এসবের হিসাব রাখি না। উপযুক্ত শিক্ষা আর পরিবেশ পেলে এসব শিশু একদিন তাদের মেধা ও সৃজনশীল প্রতিভার মাধ্যমে দেশ ও জাতিকে অনেক কিছু দিতে পারে। বিরাট অবদান রাখতে পারে।

ফুটপাতে কেন শিশুরা বড় হবে? সরকারের কি কোনো দায়দায়িত্ব নেই? সব দেশের সরকারেরই দায়িত্ব থাকে মানুষের ন্যূনতম বেঁচে থাকার মানবিক অধিকারটুকু প্রতিষ্ঠিত করবার। প্রতিটি নাগরিকের অন্ন বস্ত্র বাসস্থান চিকিৎসা শিক্ষা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা সরকারকেই নিশ্চিত করতে হয়। প্রতিটি মানুষের জীবনের নিরাপত্তা প্রদানও সরকারেরই কর্তব্য।

আমরা বাংলাদেশের মানুষ এমন এক পরিবেশে বসবাস করি যেখানে মানুষের জীবনের কোনো মূল্য নেই। গ্রাম থেকে ভাসমান পরিবার ভিড় জমায় শহরে। সামাজিক অবিচার-অনিয়মে আর নিরাপত্তার অভাবে মানুষ নিশ্চিন্ত জীবনের স্পর্শ পাচ্ছে না। সর্বদাই হতাশা ও দুশ্চিন্তা। এর মূলে রয়েছে ক্ষমতাসীনদের ঔদাসীন্য আর কায়েমি স্বার্থকে টিকিয়ে রাখার ষড়যন্ত্র।

তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার স্বাভাবিক প্রবণতা হচ্ছে ক্ষমতাসীনরা রাতের অন্ধকারে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতায় এসে রাজনীতিবিদ হবার আকাঙ্ক্ষায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও সম্পদের অপব্যবহার করে থাকে। রাতারাতি রাজনীতিবিদ হবার খায়েশে গঠন করে রাজনৈতিক দল। ক্ষমতাসীন অবস্থায় দল করতে গেলে সঙ্গে ভিড় করে সমাজ-বিরোধীরা। এরা শত অপরাধ করলেও ক্ষমতাসীনদের স্বার্থে তাদের পুরো নিরাপত্তা দেয়া হয়। প্রশাসন আইন রক্ষার পরিবর্তে স্বৈর শাসকের নির্দেশে আইন ভঙ্গকারীদের

নিরাপত্তা দিয়ে থাকে। পরিণামে অপরাধপ্রবণতা, অরাজকতা, নীতিহীনতা প্রশ্রয় পায়। প্রতিক্রিয়াশীল স্বৈরাচারের ক্ষমতারোহণের উদ্দেশ্যই হচ্ছে জাতিকে শোষণ করে দু'পয়সা কামিয়ে নেয়া, কায়েমি স্বার্থকে পোক্ত করা।

১৯৭৫-এর ১৫ আগস্টের পর থেকে এদেশে এ প্রক্রিয়া চলেছে। পরিণামে জীবন দিচ্ছে নিরীহ সামরিক অফিসার, জওয়ান, দেশের সাধারণ মানুষ ও রাজনৈতিক নেতা-কর্মীরা। অপরদিকে ক্ষমতাসীনরা এবং আশপাশের চাটুকারের দল অবৈধ উপায়ে অর্থ উপার্জন করে বাড়ি-গাড়ি আর প্রভূত সম্পদের মালিক হয়ে বিলাসী জীবন যাপনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। দেশ ও জাতির প্রতি কর্তব্য পালনের পরিবর্তে এরা সমাজকে ধ্বংস করছে। মদ, ড্রাগসহ নানা পাপাচার আজ সমাজের সর্বক্ষেত্রে ঢুকে পড়েছে এবং কারবার চলছে অবাধে। দুর্নীতি প্রবেশ করেছে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। মানবিক মূল্যবোধ, নায়নীতির আদর্শ, জাতীয় সংস্কৃতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্যসমূহ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। অন্যায়ের স্রোতে গড্ডালিকা প্রবাহের মতো গা ভাসিয়ে দিয়ে এই লুটেরা নব্যধনিক শ্রেণি জাতিকে শোষণ করছে। আর বঞ্চিত করছে দেশের বৃহত্তম জনগোষ্ঠীকে।

দিনের পর দিন মান্নান যেভাবে অত্যাচারিত হয়েও প্রতিবাদের ভাষা খুঁজে পায়নি, বাংলার শহর গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে থাকা দারিদ্র্যের কষাঘাতে অসহায় মানুষগুলিও দিনের পর দিন নির্যাতন সহ্য করতে করতে মূক হয়ে গেছে। এদের ভাগ্য বিড়ম্বনার জন্য দায়ী কারা? কারা এদের মুখের গ্রাস কাড়ছে, আজ চিহ্নিত করবার সময় এসেছে। আজ এসব মূক পোড়াখাওয়া ছিন্নমূল মানুষের মুখে প্রতিবাদের ভাষা যোগাতে হবে, প্রতিরোধের ঝড় তুলতে হবে। এদের লুপ্ত সুপ্ত চেতনাকে জাগিয়ে তুলতে হবে। ন্যায্য অধিকার থেকে কেউ যাতে এদের বঞ্চিত করতে না পারে সেই চেতনা তাদের মাঝে জাগাতে হবে।

টোকাইদের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন একটা পরিবার। যার স্নেহ-মমতার ছায়ায় সে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে পাবে। লক্ষ লক্ষ মানুষের বাস এই ঢাকা শহরে। প্রাচুর্যভরা বিলাসী জীবন আছে অনেকের।

প্রতিদিন যে উচ্ছিষ্ট ডাস্টবিনে চলে যায়, উচ্ছিষ্ট না করে উপযুক্তভাবে ব্যবহার করলে তা দিয়েই অনেক নিরন্ন শিশু লালিত-পালিত হতে পারে। একটি করে শিশুর দায়িত্ব নিলেই অনেক শিশু বাঁচার পথ পেয়ে যাবে।

খুব বেশি তো ওদের চাহিদা নেই, খাওয়া-পরার নিশ্চয়তাটুকুই। তারপর লেখাপড়া শিখিয়ে জীবন ও জীবিকার পথটুকু প্রশস্ত করে দিলেই হলো। এটা সামাজিক দায়িত্ব। মানুষের প্রতি মমত্ববোধ, ভালবাসা ও দরদ থাকলে এটা সম্ভব। মানব সভ্যতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসেবে যদি আমরা নিজেদের মনে করি তাহলে এটা অবশ্যই করা উচিত।

জনকল্যাণমুখী সরকার বা কল্যাণ রাষ্ট্র না হলে এদের দায়িত্ব রাষ্ট্রীয়ভাবে ক্ষমতাসীনরা গ্রহণ করবে না। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা না থাকলে কোনো গঠনমূলক কাজই সম্ভব নয়। মানুষের জীবন দুশ্চিন্তামুক্ত না হলে সেও কোনো কাজে আগ্রহ দেখাতে চায় না।

জন-প্রতিনিধিত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে গণমুখী অর্থনৈতিক নীতিমালা গৃহীত হয়। ক্ষমতার স্থায়িত্ব এই নীতিমালা কার্যকর করতে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে। এই নীতিমালা অবশ্যই গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করবার লক্ষ্যে হতে হবে।

ফসল উৎপাদন দ্বিগুণ-ত্রিগুণ বৃদ্ধির ব্যবস্থা, কৃষকদের ন্যায্য পাওনার স্বীকৃতি, ক্ষেতমুজরদের মজুরিসহ কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণের ব্যবস্থা, নারীদের ও বেকার যুবকদের কাজের ব্যবস্থা প্রভৃতি ছাড়াও দেশের সার্বিক উন্নয়নের প্রশ্নে চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। মানুষের খাওয়া-পরা-চিকিৎসার ব্যবস্থা, প্রাথমিক পর্যায় থেকে উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার সুযোগ-সুবিধা প্রদানের অঙ্গীকার ও তা বাস্তবায়নের বাধ্যতামূলক পদক্ষেপের উদ্যোগ নিশ্চিত করতে হবে।

দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক হলো শিশু-কিশোর। প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থাকে শতকরা আশি ভাগ শিশু। পেটে ভাত, পরনের কাপড়, শরীরে পুষ্টি না থাকলে শিক্ষার তাগিদ কেমন করে অনুভব করবে? আর সামর্থ্যে না কুলালে পিতামাতাই বা স্কুলে

পাঠাবে কেন? কাজেই প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক, অবৈতনিক ও একই ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করে এই সমস্যা দূর করা সম্ভব। সব শিশুর স্কুল গমন ও শিক্ষা গ্রহণে ছিন্নমূল প্রভৃতি সব শিশুর জন্য দিনের একটি নির্দিষ্ট সময় বেধে দিতে হবে যেন এ সময়টা তাদের স্কুল ছাড়া অন্যত্র কোথাও দেখতে না পাওয়া যায়। দরিদ্র ও গরিব শিশুদের জন্য অন্তত এক বেলা খাবার, বিনামূল্যে পুস্তক ও পোশাক বিতরণ করে তাদের শিক্ষাগ্রহণ আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে। দেশ ও জাতির উন্নতি চাইলে আগামীদিনের জন্য উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে। প্রতিটি নাগরিকের নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে এটা প্রধান শর্ত। সকল প্রকার সামাজিক বৈষম্য দূর করে শোষণহীন সমাজ গঠিত হলেই দরিদ্র ছিন্নমূল মানুষ বাঁচার সার্থকতা খুঁজে পাবে।

স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে অর্থ যোগান কিভাবে হবে? প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। আমাদের জাতীয় বাজেটের এক বিরাট অংশ অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় হয়ে থাকে। বিলাসবহুলতায় অযৌক্তিক অর্থ ব্যয় হয়। শিল্প-কলকারখানার বিকাশ না ঘটিয়ে অর্থনীতিকে আমদানিনির্ভর করে ফেললে স্বাভাবিক নিয়মেই দুর্নীতি ও অপচয় বৃদ্ধি পায়। জরুরি ও অতি প্রয়োজনীয় ছাড়া সকল অনুৎপাদনশীল খাতের ব্যয় বন্ধ করে তা শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও শিশুদের উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। এছাড়া বিদেশি সাহায্য ও ঋণ সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে দুস্থ ও ছিন্নমূল মানুষের জীবনযাপনের মান উন্নয়নের কাজে ব্যয় হওয়া উচিত। রাষ্ট্রীয়ভাবে যেসব বিদেশি সাহায্য-সহযোগিতা আসে, শৃংখলাপূর্ণ নীতিমালার ভিত্তিতে তার ব্যয় হতে হবে। দেশে বর্তমানে নব্বই ভাগ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করছে। এক ভাগেরও অনেক কম লোক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করছে, বাকিরা জীবনযুদ্ধে কোনমতে টিকে আছে।

বিদেশি ঋণ জাতির কাঁধে দিনের পর দিন বোঝা বাড়াচ্ছে। কিন্তু তা জাতীয় স্বার্থে ব্যবহৃত হচ্ছে না। সঠিক নীতিমালায় ব্যবহৃত হলে দেশের অর্থনীতির উন্নতি করা সম্ভব হতো। গত তেরো বছরে তা প্রমাণিত হয়েছে। শহর-গ্রাম সর্বত্র মানুষ খাওয়া-পরার অনিশ্চয়তা ও দারিদ্র্যে ভুগছে। অপুষ্টির কারণে বহু শিশু অন্ধ ও বিকলাঙ্গ হয়ে

যাচ্ছে। এখন এই বিশাল জনগোষ্ঠীর উন্নতি চাইলে সার্বিক উন্নয়নের কর্মসূচি ও তা বাস্তবায়ন দরকার।

আমি আগে বলেছি এইসব ভাষাহারা মূক মানুষগুলির মুখে ভাষা যোগাতে হবে। সুপ্ত চেতনা জাগ্রত করতে হবে। ধুঁকে ধুঁকে মরার আগে শোষকের বিরুদ্ধে একবার অন্তত প্রতিবাদের ভাষা ফোটাতে হবে। কোনো বুলেট বা ক্যুতো সেই সমুদ্রসমান প্রতিরোধকে রুখতে পারবে না। আটচল্লিশ থেকে বায়ান্ন, ঊনসত্তর, একাত্তর, আমাদের সেই চেতনায় উজ্জীবিত করে রাখে বলেই আমরা কখনও হতাশ হই না। নূর হোসেনরা বার বার বুকের রক্ত দিয়ে স্বৈরতন্ত্রের পতন চায়, নূর হোসেনরা চায় সমাজের সার্বিক পরিবর্তন।

শোষিত জনগণ যখন সেই প্রতিরোধের ঝড় তুলবে, শোষকের প্রাসাদ তাসের ঘরের মতো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব চেয়েছিলেন যুগ যুগ ধরে নিষ্পেষিত হয়ে আসা মানুষ আর এই ঘুণে-ধরা সমাজ ভেঙ্গে এক নতুন সমাজ গড়ে তুলবেন। তাই নিজের সব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলন চালিয়ে পাকিস্তানি সামরিক শোষকদের হাত থেকে মুক্তি পেতে দীর্ঘ চব্বিশ বছর লড়াই করে দেশের স্বাধীনতা এনে দেন। মানুষের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য, কিন্তু স্বাধীনতা-বিরোধীরা মাত্র সাড়ে তিন বছরের মধ্যেই তাকে হত্যা করে ক্ষমতা দখল করে। স্বাধীনতাকে সুসংহত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত দেশকে পুনর্গঠন ও স্থিতিশীল করে গড়ে তোলার সময়টুকুও তাঁকে দেয়া হয় নাই। যারা তাঁর সমালোচনা করেছে, হত্যা ও ষড়যন্ত্র করেছে, দেশ ও জনগণের উন্নয়ন কতটুকু তারা করেছে সেটাই আজ প্রশ্ন। অর্থ লুট, সম্পদ লুট, ভোগ লুট—শুধু লুটপাটের রাজত্ব কায়েম হয়েছে। দেশ আজ ধ্বংসের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে। আজ আশা নেই, আকাঙ্ক্ষা নেই–সম্ভাবনা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে!

আমরা যারা জনগণের অবস্থায় বিশ্বাসী, তারা জনগণের মঙ্গলের আকাঙ্ক্ষায় রাজনীতি করি। আজ মান্নান প্রতিবাদ করতে শিখেছে, কেননা সে জানে তার উপর অত্যাচার হলে প্রতিকার পাওয়া যাবে।

আমরা সেই সমাজ ব্যবস্থাই চাই যেখানে মানুষের জীবনের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা থাকবে। যেখানে প্রতিটি শিশু হবে রাষ্ট্রীয় সম্পদ। তার জন্ম থেকে স্বাবলম্বী হওয়া পর্যন্ত সব দায়দায়িত্ব নেবে সরকার। কোনো শিশুর প্রতি নিষ্ঠুর নির্যাতন নয়, শ্রেণিবিভেদ-বৈষম্য নয় তার মধ্যে যে মেধা ও সৃজনীশক্তি লুকিয়ে আছে তা মধ্যাহ্নের রৌদ্রের মতো বিকাশের সুযোগ করে দিতে হবে।

এইসব শিশুর শান্তিময় সমৃদ্ধপূর্ণ ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে আমরা যদি নিঃস্বার্থ এবং ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে যেতে পারি তাহলে নিশ্চয় আগামী প্রজন্মকে কষ্ট ভোগ ও হতাশাগ্রস্ত হতে দেখা যাবে না। আসুন আমরা আগামীদের জন্য আমাদের বর্তমানকে উৎসর্গ করি। আমাদের আত্মত্যাগ নিশ্চয় তাদেরকে দেশ ও জাতির কল্যাণের জন্য সচেতন করে তুলবে, উজ্জীবিত করে রাখবে দেশপ্রেমের চেতনায়।

রচনাকাল : জুন ১৯৮৮
প্রকাশিত : সাপ্তাহিক বিচিত্রা।